# একক—১১ ❐ বিচার বিভাগ

গঠন

১১.০ উদ্দেশ্য

১১.১ প্রস্তাবনা

১১.২ আদালত ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া

১১.৩ আইনের প্রকৃতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া

১১.৪ আইনের কাঠামো ও বিচারপতিদের নিয়োগ

১১.৪.১ বিচার বিভাগের কার্যাবলী

১১.৫ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

১১.৬ বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ

১১.৭ সারাংশ

১১.৮ উত্তরসংকেত

## ১১.০ উদ্দেশ্য

মানুষের অধিকার সুনিশ্চিত ও সংরক্ষিত করতে, অপরাধীর শাস্তি বিধান করতে, অন্যায়ের হাত থেকে নিরীহ মানুষকে রক্ষা করতে রাষ্ট্রকে একটি পৃথক বিভাগ গড়তে হয়েছিল। সৃষ্টি হয়েছিল বিচারব্যবস্থার। এই এককটি পড়লে আপনারা জানতে পারবেন—

- আদালত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ কিভাবে হয়
- আইনের প্রকৃতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কিভাবে পরস্পর সম্পৃক্ত
- আইনের কাঠামো কিভাবে তৈরী হয়
- বিচারপতিদের নিয়োগ, কার্যাবলী, ও নিয়ন্ত্রণ কিভাবে সম্পাদিত হয়
- বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা কিভাবে রক্ষিত হয়

## ১১.১ প্রস্তাবনা

ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য মানুষের কতগুলি অধিকার প্রয়োজন। এই অধিকারগুলি রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্ব মূলত বিচার বিভাগই সম্পাদন করে। আইনের ব্যাখ্যা, বিরোধের মীমাংসা, অধিকারগুলি বাস্তবে কার্যকর করা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিচার বিভাগকেই করতে হয়। প্রকৃত পক্ষে বিচার বিভাগ ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না।

বিচার বিভাগ আধুনিক শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সরকারের সঙ্গে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির কিংবা অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যক্তির যে সমস্ত বিরোধের উৎপত্তি হয় তার ন্যায়-সঙ্গত মীমাংসার জন্য বিচারবিভাগের প্রয়োজন অনিবার্য। স্বাধীনতা, সাম্য ও নাগরিক অধিকার প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক রাষ্ট্রের ঔৎকর্ষ অনেকখানি নির্ভর করে নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার উপর। তাই রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে বিচার ব্যবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রাজনৈতিক দিক বিচার বিভাগ নিরপেক্ষ হ'তে পারে না, কেননা, বিচার ব্যবস্থার কাঠামো, পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য ও রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। সেই কারণে, বিচার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট ধরনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। অধ্যাপক বলের মতে, বিচারপতি ও আদালত হ'ল সামগ্রিকভাবে প্রচলিত রাজনৈতিক পদ্ধতির একটি অংশ-বিশেষ। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার উপর আদৌ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

**অনুশীলনী—১**

বিচার বিভাগ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বিরোধের মীমাংসা করে?

## ১১.২ আদালত ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে বিচার বিভাগের সম্পর্কের বিষয়টিকে ঘিরে পরস্পরবিরোধী মতামত লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল ঃ বিচার বিভাগের সাথে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার কোন সম্পর্ক নেই। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও বিচার বিভাগের মধ্যে পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকে। এই সাবেকি ধারণা সাধারণত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চালু থাকে। কিন্তু, এ সম্পর্কে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল বিচারব্যবস্থা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। উভয়ের মধ্যে নিরন্তর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (Interaction) চলে। প্রচলিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বিচার বিভাগ বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না।

অধ্যাপক অ্যালান বলের মতে, আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রশাসনিক আদালত ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (Administrative courts and administrative tribunals)-এর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কাঠামোর মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা অস্পষ্ট হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের উল্লেখ করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্ট নিছক একটি আইনী প্রতিষ্ঠান নয় ; কার্যক্ষেত্রে এটি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও বটে। জাতীয় নীতির বিভিন্ন বিতর্কিত প্রশ্নে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নাগরিক অধিকার, রাষ্ট্রপতি, কংগ্রেস প্রভৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে অধ্যাপক বল একথাও বলেছেন যে, মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের মত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অন্য সমস্ত আদালতের নেই।

বিচার ব্যবস্থা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ারই অংশ বিশেষ। অধ্যাপক বল এ ক্ষেত্রে দু'টি মূল বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। (১) সাধারণত, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অসীম শক্তিশালী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অধ্যাপক বল অবশ্য এ ধরনের

ধারণাকে আধা-অলীক (Semi fiction) বলে উল্লেখ করেছেন। এই ধারণা বহু রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্বের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। সেই কারণে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রশাসনিক আদালত ও আধা-বিচার বিভাগীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের প্রসারে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। (২) আবার, এই কারণে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর জোর দেওয়া হয় ; কেননা সরকারের হাতে মাত্রাতিরিক্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অতি গণতন্ত্র বা সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

**অনুশীলনী—২**

বর্তমানে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কাঠামোর মধ্যে সীমারেখা কেন অস্পষ্ট হচ্ছে?

## ১১.৩ আইনের প্রকৃতি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া

রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আইন নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। একই রকমভাবে আইনের প্রকৃতিগত পরিবর্তন রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং স্বৈরতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আইনের প্রকৃতি এবং আইনের কাঠামো এক ধরনের হয় না।

অ্যালান বল উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনের পরিকাঠামোর কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন, নিরপেক্ষতা, সামঞ্জস্যতা, খোলামেলা প্রকৃতি, অনুমান যোগ্যতা ও স্থায়িত্ব। এই ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচারকার্য সর্বসমক্ষে সম্পাদিত হয়। এখানে আইনের পদ্ধতি হ'ল অবাধ, উন্মুক্ত, সকলের কাছে অবহিত এবং আইনের পদ্ধতি একটি নির্দিষ্ট ধারায় পরিচালিত হয়। একেই অনেক সময় আইনের অনুশাসন বলে।

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন ও বিচার ব্যবস্থায় যে সমস্ত উপাদানের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি সব সময় কার্যকর হয় না। যুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ গোলযোগজনিত কারণে জরুরী অবস্থায় সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। তার ফলে, জরুরী অবস্থায় সরকার স্বাভাবিক বিচার বিভাগীয় পদ্ধতিকে স্থগিত রাখে। আবার, অনেক সময় স্বাভাবিক অবস্থাতেও আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কারণে পুলিশকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক প্রভৃতি সকল রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই আইন ব্যবস্থা রাজনৈতিক মূল্যবোধ নিরপেক্ষ নয়। সেই কারণে অধ্যাপক বল বলেছেন যে, কেবলমাত্র মতাদর্শগত ভিত্তিতে বিভিন্ন আইনের ব্যবস্থার মধ্যে শ্রেণী বিভাজন করা কষ্টকর।

## ১১.৪ আইনের কাঠামো ও বিচারপতিদের নিয়োগ

অ্যালান বল আইনের কাঠামো ও বিচারপতিদের নিয়োগের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, বিভিন্ন কারণে আইনের কাঠামোর মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক স্তরে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক আইন নিষ্পত্তির জন্য দু'টি পৃথক আদালত ব্যবস্থার প্রয়োজন নির্দেশ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিতে রাজ্য আদালতের সাথে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের শাখাও আছে। মার্কিন বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে সুপ্রীম কোর্ট।

আইনের কাঠামোর ভিন্নতার অন্য একটি কারণ হল বিশেষীকরণ (Specialisation) নীতির প্রয়োগ। জার্মানীতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য রয়েছে পৃথক আদালত ; রয়েছে বিশেষ প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক আদালত। ব্রিটেনে পৃথক সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক আদালত নেই, কিন্তু ফ্রান্সের মতে নীচের স্তরে পৃথক ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালত আছে। এখানে লর্ডসভা সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসেবে কাজ করে। প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিষয় কমিটি (The Judicial Committee of the Privy Council) কমনওয়েলথভুক্ত কোন কোন দেশের আপীল আদালত হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকে।

আদালতের দায়িত্ব বা কার্যাবলীর সাথে আইনী ব্যবস্থার কাঠামো সম্পর্কিত। যেমন, কোথাও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে, আবার কোথাও প্রশাসনিক বা পৌর অধিকার সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে আদালতের ব্যবহার করা হয়।

আদালতের ব্যাপক কাজের সঙ্গে যে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্য বহন করে তা হ'ল বিচারকদের নিয়োগের পদ্ধতি। বিচারকদের বিচক্ষণতা, দৃষ্টিভঙ্গী, দক্ষতা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে তাঁদের নিয়োগ করা হয়। সরকার বিচারপতিদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিযুক্ত করে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারকদের সহযোজন (Cooption)-এর নিয়ম চালু আছে।

বিচারকদের আইনগত প্রশিক্ষণ এবং যোগ্যতার মধ্যেও তারতম্য আছে। পশ্চিম জার্মানী ও ফ্রান্সে বিচারকদের একটি ক্রমোচ্চ পেশাগত কাঠামো আছে। দুই দেশেই বিচারকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ডিগ্রীলাভ করার পর সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ব্রিটেনে যেমন ব্যারিষ্টারদের মধ্য থেকে বিচারক নিয়োগের প্রথা আছে এ সব দেশে তেমন নিয়ম নেই। জীবনের শুরুতেই বিচারকার্যকে পেশা হিসেবে পছন্দ করাই এদেশের রীতি। বিচারকদের কাজের স্থায়িত্বের নিরাপত্তাও এখানে আছে। এখানে বিচারকরা প্রধানত উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেই আসেন। দু'টি দেশেই বিচারকরা প্রশাসনিক কর্মচারীদের মতই একটি ঐতিহ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং রাষ্ট্রের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করার মানসিকতার দ্বারা এঁরা পরিচালিত হন।

ব্রিটেনের বিচারকরা রক্ষণশীল এবং এঁদের স্থায়িত্বের নিরাপত্তাও লক্ষ্য করা যায়। উচ্চ আদালতের বিচারকরা এখানে অসৎ আচরণের কারণে পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের মাধ্যমে পদচ্যুত হন। প্রশিক্ষণ, নিয়োগের পদ্ধতি, বিচারকদের পদের প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদা—সব কিছু মিলে ব্রিটেনে বিচারকেরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্বের এক শক্তি হিসেবেই চিহ্নিত হন বলে অধ্যাপক অ্যালান বল মনে করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেনেটের সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের মনোনীত করেন এবং এক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনাই অধিক গুরুত্ব লাভ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা বিশেষ নীতির প্রশ্নে বিতর্ক বা বিরোধিতা করেন, রাষ্ট্রব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেন না। এই দেশে বিচারপতি নিয়োগের শ্রেণীগত অবস্থান গুরুত্ব পায়। প্রায় ৮৮ শতাংশ বিচারপতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীগুলি থেকে আসেন। এঁরা প্রধানত উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। শ্রেণীগত বা রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা যথেষ্ট উদারভাবাপন্ন।

অ্যালান বল-এঁর মতে, বিচারকদের পদের নিরাপত্তা সরকার বা নির্বাচকমণ্ডলীর চাপের হাত থেকে তাঁদের মুক্ত রাখবে বা তাঁদের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখবে—একথা সব সময়ে ঠিক নয় ; তবে, বিষয়টি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পক্ষে প্রয়োজনীয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাশালী শ্রেণীর কর্তৃত্বকে শক্তিশালী করতে বিষয়টি

বিচার বিভাগকে সাহায্য করতে পারে। সমস্ত স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই প্রবণতা দেখা যায়। বিচার ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করার কারণেই বিভিন্ন বিকাশশীল রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অস্থায়িত্ব দেখা গেছে।

## ১১.৪.১ বিচার বিভাগের কার্যাবলী

যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের কাজকর্মের পরিধি বিশেষীকরণের মাত্রার (degree of specialisation) উপর নির্ভর করে। বস্তুত, বিচার বিভাগের কার্যাবলী রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। অধ্যাপক বল বিচার বিভাগের চারটি নির্দিষ্ট কাজের কথা বলেছেন—(১) বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা ও সংবিধানের ব্যাখ্যা ; (২) রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মধ্যস্থতা ; (৩) প্রচলিত ব্যবস্থাকে সমর্থন যোগানো এবং (৪) ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ।

বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা (Judicial Review) আদালতের একটি বড় দায়িত্ব। এই ক্ষমতার ফলে বিচার বিভাগ যে কোন আইন ও সরকারী সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিতে পারে। আইন বিভাগ যদি এমন আইন তৈরী বা শাসন বিভাগ এমন কোন আদেশ জারী করে সংবিধান বিরোধী, তা হলে সেই আইনকে বাতিল করার যে ক্ষমতা বিচার বিভাগের হাতে আছে তাকে বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার অধিকার (Power of Judicial Review) বলে। এই বিশেষ ক্ষমতার বলেই বিচার বিভাগ সংবিধানের রক্ষক ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসেবে কাজ করে। সংবিধান ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিচার বিভাগ কোন আইনের বৈধতাও বিচার করতে পারে। কোন মামলার সাথে আইনের ব্যাখ্যা যুক্ত থাকলে আইনের প্রকৃতি প্রসঙ্গে আদালত তার অভিমত ব্যক্ত করতে পারে। আইনের বৈধতা বিষয়ে প্রশ্ন উঠলে আদালত আইনের বৈধতা বিচার করে থাকে। আদালত আইনের বৈধতা বিচারের মাধ্যমে বিচার্য আইনকে অ-সাংবিধানিক বলে ঘোষণা করতে পারে। আদালতের এই সংবিধান ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংবিধানের অনমনীয়তাকে দূর করে আদালত এবং এইভাবেই পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সাথে সংবিধানের সামঞ্জস্য বিধান করে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ বিভিন্ন রকম বিরোধের মীমাংসা করে থাকে। সাংবিধানিক উপায়ে বা সংবিধান ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিচার বিভাগই এই সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করে। সরকারের অন্য দুটি বিভাগ শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। আবার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যেও বিরোধের সৃষ্টি হতে পারে। সাংবিধানিক আদালত এই বিরোধের মীমাংসা করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। তবে, মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের এই ভূমিকা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে, এ প্রসঙ্গে মাককুলক বনাম ম্যারিল্যাণ্ড [McCulloch Vs. Maryland (1821)] মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অ্যালান বল বলেন যে, এ কথা সত্যি নয় যে, সাংবিধানিক আদালতের সিদ্ধান্ত সব সময় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করেছে। আবার এই ধারণাও ঠিক নয় যে, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে দ্বন্দ্বে সাংবিধানিক আদালত শাসন বিভাগের অনুকূলে রায় দেয়। অধ্যাপক বলের মতে, বিংশ শতাব্দীতে শক্তিশালী ও জটিল ক্ষমতা জাতীয় সরকারের হাতে তুলে দেবার যে আন্দোলন হয়েছে, সাংবিধানিক আদালত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে সেই আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেছে। এই ভাবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে সাংবিধানিক আদালত নিজের ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠিত করতে

পেরেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হল প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষা ও সমর্থনের কাজ। প্রচলিত ব্যবস্থার সমর্থন যোগানোর বিষয়টি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থার রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপর। রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিচার বিভাগের অন্যতম কর্তব্য হল প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও ভারতবর্ষের বিচার বিভাগ সংবিধানের ব্যাখ্যার মাধ্যমে সাধারণত, কেন্দ্রীয় সরকারের হাত শক্তিশালী করেছে। অনেক সময় সরকারী নীতি ও কার্যাবলীর উপর বৈধতার চিহ্ন দিয়ে বিচার বিভাগ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করে।

সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগ নাগরিক অধিকারের রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ করে। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগ জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। যে দেশে লিখিত সংবিধান আছে সেখানে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগকে সংবিধানের গণ্ডীর মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। সরকার যদি সংবিধানে লিপিবদ্ধ নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে তাহলে বিচার বিভাগ সেই অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করতে পারে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাংবিধানিক আদালত শক্তিশালী সরকারের স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ থেকে নাগরিক অধিকারকে সংরক্ষণ করতে পারে। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের আদালত এই উদ্দেশ্যে আদেশ-নির্দেশ বা লেখ (Writ) জারী করতে পারে।

উপরোক্ত চারটি মূল ক্ষেত্রের বাইরেও সাংবিধানিক আদালতের অন্যান্য কার্যাবলী আছে। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে বিতর্কিত নির্বাচনী এলাকা ও নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধের ক্ষেত্রে রায় দান। জরুরী অবস্থা সম্পর্কিত ক্ষমতা প্রয়োগ বা অন্যান্য বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধানকে পরামর্শ প্রদান, রাজনৈতিক বিরোধ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

**অনুশীলনী—৩**

আধুনিক রাষ্ট্রের বিচার বিভাগের কার্যাবলী সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

## ১১.৫ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অত্যন্ত জরুরী। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় যে, বিচারপতিগণ সমস্ত রকম রাজনৈতিক, শাসনবিভাগীয় ও আইনবিভাগীয় হস্তক্ষেপ ছাড়াই নির্ভয়ে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। তাঁরা নিজেদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধের মীমাংসা করবেন। প্রকৃতপক্ষে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা পরস্পরের পরিপূরক, বিচার বিভাগের উপর সরকারের অন্য দুটি বিভাগের হস্তক্ষেপ ঘটলে ন্যায় বিচার ব্যহত হয়। তাই ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ বিচারের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা জরুরী। লর্ড ব্রাইসের মতে, সরকারের ঔৎকর্ষ নির্ভর করে বিচার বিভাগের কর্মকুশলতার উপর। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর।

সৎ, সাহসী এবং প্রকৃত আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণ দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে বিচারপতির পদে নিযুক্ত হলে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকে। বিচারপতি নিয়োগের বিষয়ে প্রার্থীদের গুণগত যোগ্যতাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিচারকদের নিয়োগ পদ্ধতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিচারপতিদের সাধারণত তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে নিযুক্ত করা হয় ঃ (১) জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন, (২) আইনসভার দ্বারা মনোনয়ন এবং (৩) শাসনবিভাগ দ্বারা নিয়োগ।

বিচারকদের কার্যকালের মেয়াদের উপরও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভরশীল। কার্যকালের স্থায়িত্ব না থাকলে নিষ্ঠার সাথে বিচার কার্যের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য বিচারপতিদের নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা উচিত।

বিচারকদের অপসারণ পদ্ধতির উপরও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে। অকারণ বা সামান্য কারণে পদচ্যুত হওয়ার আশংকা থাকলে বিচারকদের পক্ষে ন্যায়বিচার করা সম্ভব হয় না।

বিচারকদের বেতন ও ভাতার উপরও নির্ভর করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। স্বল্প বেতনভোগী বিচারপতিদের দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতা থাকে। সেই কারণে শ্রেষ্ঠ, যোগ্যতাসম্পন্ন আইনজ্ঞকে বিচারক পদে আকৃষ্ট করার জন্য বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা যথেষ্ট হওয়া দরকার।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য আইন ও শাসনবিভাগ থেকে তার পৃথকীকরণ অপরিহার্য। বর্তমানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির আংশিক প্রয়োগ বলতে এই বিচার বিভাগের পৃথকীকরণকে বোঝায়। ল্যাস্কির মতে, শাসকের হাতে বিচারের দায়িত্ব থাকলে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হয় এবং শাসনবিভাগ সহজেই স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। বিচারবিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য অধিকাংশ দেশে বিচার ব্যবস্থাকে শাসনবিভাগীয় হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উপরোক্ত ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। ল্যাস্কি প্রমুখ লেখকদের মতে, বিচার বিভাগ প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং, বিচার বিভাগের পক্ষে রাজনীতি নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন কাজ। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো ও চরিত্রের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

**অনুশীলনী—৪**

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

## ১১.৬ বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ :

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার উপর আনুষঙ্গিক কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হল বিচারপতিদের বাছাই করার পদ্ধতি, পদ্ধতিগত নিয়মকানুন বিশেষত, বিচারবিভাগীয় নজিরের প্রতি বিচারপতিদের একনিষ্ঠতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপের বিষয়ে বিচারপতিদের সংবেদনশীলতা প্রভৃতি। তাছাড়াও রয়েছে আইনগত বৃত্তির কতকগুলি প্রতিষ্ঠিত আচরণবিধি। এই সমস্ত বিধিব্যবস্থা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে বিচার বিভাগের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবিত করে।

এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা ছাড়াও বিচার বিভাগের উপর কিছু প্রতিষ্ঠানগত (Institutional) নিয়ন্ত্রণ আছে। প্রথমত, নতুন আইনের মাধ্যমে আইন বিভাগ বিচার বিভাগকে অসুবিধায় ফেলতে পারে। বিচারকদের অপসারণের ক্ষেত্রেও আইন বিভাগের ভূমিকা থাকতে পারে। দ্বিতীয়ত, সংবিধান সংশোধন করে বা নতুন ভাবে আইন রচনা করে বিচার বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায়। তৃতীয়ত, আদালতের দায়িত্বের ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ এনে রাজনৈতিক চাপ বা দাবীর প্রতি আদালতকে স্পর্শকাতর করে তুলতে পারে। সন্দেহ নেই, সাংবিধানিক আদালত এবং প্রশাসনিক আদালতের মধ্যে পার্থক্য এইভাবেই সৃষ্টি। আধা-বিচার বিভাগীয় সংস্থার ধারণা এইভাবে এসেছে। বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম হল শাসন বিভাগ। শাসন বিভাগের উপর বিচার বিভাগ অত্যন্ত নির্ভরশীল। বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য শাসন বিভাগের সাহায্য প্রয়োজন। সমস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই বিচারবিভাগীয় বিষয়ের জন্য আলাদা মন্ত্রক ও মন্ত্রীর অস্তিত্ব দেখা যায়। সুতরাং, রাজনৈতিক ব্যবস্থার অংশসমূহের সঙ্গে বিচার বিভাগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার

সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। অধ্যাপক বলের মতে, বিচার বিভাগের ক্ষমতা রাজনৈতিক জোট বা বিন্যাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে। তিনি সুনিশ্চিত যে, বিচার বিভাগ এই জোটেরই এক বৈধ অংশ।

## ১১.৭ সারাংশ

বিচার বিভাগ আধুনিক শাসনব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অংশ। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক রাষ্ট্রের উৎকর্ষ নির্ভর করে নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার উপর। তবে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতার বিষয়টি যথেষ্ট বিতর্কিত। অনেকের মতে বিচার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট ধরনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। তাই বিচার বিভাগ নিরপেক্ষ হতে পারে না। অধ্যাপক বল বিচার বিভাগের নির্দিষ্ট কয়েকটি কাজের কথা বলেছেন। এই সমস্ত কার্যাবলীর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সরকারের আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সাথে বিচার বিভাগের সম্পর্ক হ'ল, সহযোগিতার। তবে প্রয়োজনে কোন কোন ক্ষেত্রে বিচার বিভাগ সরকারের জন্য দুই বিভাগকে নিয়ন্ত্রণও করে। সাম্প্রতিককালে দেখা যায় যে, বিচার বিভাগ অত্যন্ত কার্যকরীভাবে সরকারের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করছে। ফলে, বিচার বিভাগের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিচার বিভাগের এই ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অনেকে বিভিন্ন আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন। সেই প্রসঙ্গে বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটিও উত্থাপিত হয়েছে।

## ১১.৮ উত্তরসংকেত

**অনুশীলনী—১**

১১.১ অংশ দেখুন

**অনুশীলনী—২**

১১.২ অংশ দেখুন

**অনুশীলনী—৩**

১১.৪.১ অংশ দেখুন

**অনুশীলনী—৪**

১১.৫ অংশ দেখুন

# একক—১২ ❐ ক্ষমতা পৃথকীকরণের তত্ত্ব

গঠন

১২.০ উদ্দেশ্য
১২.১ প্রস্তাবনা
১২.২ ক্ষমতা পৃথকীকরণের অর্থ
১২.৩ এই নীতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
১২.৪ ১২.৩.১ মন্টেস্কুর অবদান
১২.৩.২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ
১২.৫ মূল্যায়ন
১২.৬ সারাংশ
১২.৭ উত্তরমালা
১২.০ গ্রন্থপঞ্জী

## ১২.০ উদ্দেশ্য

সরকারের তিনটি বিভাগের ক্রিয়াকলাপের বিভাগীয় পৃথকীকরণের পরামর্শ দিয়েছিলেন ইংরেজ রাষ্ট্রদার্শনিক জন লক সপ্তদশ শতাব্দীতে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী লেখক মন্টেস্কুর নামের সাথেই জড়িয়ে আছে ক্ষমতা পৃথকীকরণের তত্ত্ব। এই এককটির মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন—

- ক্ষমতা পৃথকীকরণের অর্থ
- এই তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
- এই তত্ত্বে মন্টেস্কুর অবদান
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ
- এই নীতির মূল্যায়ন

## ১২.১ প্রস্তাবনা

পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সমস্ত ইচ্ছা প্রকাশিত হয় সরকারের মাধ্যমে এবং আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ সরকারের কার্যাবলীকে পরিচালিত করে। এখন প্রশ্ন হল সরকারী ক্ষমতা বন্টনের বিষয়ে এই তিনটি বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক কি রকম হবে? সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার থেকে মুক্ত করার বিষয়ে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির উদ্ভব।

## ১২.২ ক্ষমতা পৃথকীকরণের অর্থ

বহু প্রাচীনকাল থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সরকারী ক্ষমতার শ্রেণীবিভাগ ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে বহু মতবাদ প্রচার করেছেন। এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতিটি সুপরিচিত। এই নীতি অনুসারে সরকারের সমস্ত ক্ষমতা আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে বন্টিত করা উচিত। কারণ, সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে ন্যস্ত থাকলে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা বিপন্ন হতে বাধ্য। সুতরাং, এই নীতি অনুসারে সরকারের এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর একাধিক বিভাগের ক্ষমতা ন্যস্ত করা যাবে না। অর্থাৎ, সরকারের প্রত্যেক বিভাগের ক্ষমতার একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা বা গণ্ডী থাকবে। ক্ষমতা পৃথকীকরণের এই ধারণাকে সাবেকি ধারণা বলা হয়। আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই নীতির ব্যাখ্যা ভিন্ন ভাবে করা হয় এবং উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই নীতির আংশিক প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয় না।

**অনুশীলনী—১**

ক্ষমতা পৃথকীকরণের অর্থ কী?

## ১২.৩ এই নীতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল সর্বপ্রথম সরকারী ক্ষমতাকে আইন (deliberative), শাসন (magisterial) এবং বিচার (judicial) এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং এই তিনটির বিভাগকে পৃথক রাখার সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। শ্রম বিভাগের নীতিকে অনুসরণ করে তিনি বলেন যে, একাধিক বিভাগের কার্যভার এক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর ন্যস্ত থাকলে শাসনকার্য সুচারুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। অ্যারিস্টটলের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে রোমান রাষ্ট্রদার্শনিকদ্বয় পলিবিয়াস (Polybius) এবং সিসেরো (Cicero) মন্তব্য করেন যে, সরকারী ক্ষমতা বন্টনের দ্বারাই বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যায়। মধ্যযুগেও এই নীতি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী রাষ্ট্রদার্শনিক বোদাঁ (Bodin) ক্ষমতাকে পৃথিকীকরণ নীতির একজন সমর্থক ছিলেন। সপ্তদশ শতকে ইংলন্ডে জন লব (John Locke) এই নীতিকে অবলম্বন করেই গৌরবময় বিপ্লবকে (১৬৮৮) সমর্থন করেন।

উপরোক্ত রাষ্ট্র দার্শনিকরা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির কথা উল্লেখ করলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মন্টেস্কু (Montesquieu)-র নামের সাথেই যুক্ত হয়ে আছে এই নীতি। ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি Spirit of Laws নামক গ্রন্থটি রচনা করেন এবং তখন থেকেই তাঁকে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির জনক বলে উল্লেখ করা হয়। তদানীন্তন ফরাসী রাজতন্ত্রের চরম স্বৈরাচারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি ইংলন্ডে যান ; সেখানে দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বকালে জনগণের স্বাধীনতা ও অধিকারের একমাত্র রক্ষাকবচ। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের

শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা করে তিনি মন্তব্য করেন যে, সরকারের কার্যভার পৃথক ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত না হলে জনগণের স্বাধীনতা লাভের কোন আশা নেই।

মন্টেস্কুর এই মতবাদ বিশ্লেষণ করলে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—(১) রাষ্ট্রের সামগ্রিক ক্ষমতা যথা—আইন, শাসন ও বিচার সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে বন্টিত করতে হবে ; (২) সরকারের তিনটি বিভাগ সম্পূর্ণরূপে পৃথক ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত হবে ; (৩) কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টির হাতে একাধিক বিভাগের ক্ষমতা অর্পণ করা হবে না ; (৪) রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র এমনভাবে রচিত হবে যাতে এক বিভাগ অপর বিভাগের উপর কখনই প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংলন্ডের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার পৃথকীকরণ সম্পর্কে মন্টেস্কুর ধারণা নির্ভুল ছিল না। বস্তুত, ইংলন্ডের শাসন ব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে পৃথক নয়। মন্টেস্কু ইংলন্ডের শাসনব্যবস্থার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করতে পারেন নি একথা অবিশ্বাস্য। আসলে তদানীন্তন ফরাসী রাজতন্ত্রের চরম স্বৈরাচার ও জনগণের দুর্গতির প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই তিনি এই মতবাদ প্রচার করেন। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ যে অবাঞ্ছনীয় ও অবাস্তব সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন। ফাইনার (Finer) মন্তব্য করেছেন যে, মন্টেস্কুর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতার পৃথিকীকরণের দ্বারা স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবাধ ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং এমন একটি নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার গুণকীর্তন করা যেখানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা হবে পরিমিত এবং নিয়ন্ত্রিত। চরম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না।

## ১২.৩.১ মন্টেস্কুর অবদান

মন্টেস্কু তাঁর ক্ষমতা পৃথিকীকরণের নীতির মাধ্যমে এ কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অনিয়ন্ত্রিত হলেই ক্ষমতার অপপ্রয়োগের প্রবণতা স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেবে। সরকারের যে কোন দু'টি বিভাগ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যুক্ত হলেই ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন হয়। মন্টেস্কু ইংলন্ডের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করলেও তাঁর প্রচলিত ক্ষমতার পৃথিকীকরণ নীতি তৎকালে বিশ্বের বহু দেশের শাসনতন্ত্রের উপর এতই গভীর প্রভাব বিস্তার করে যে প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় ভাষাতেই তাঁর Spirit of Laws গ্রন্থটি অনুবাদ করা হয়। এ প্রসঙ্গে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মন্টেস্কু তাঁর পূর্বসূরি জন লক-এর Second Treatise দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। লক বলেছিলেন যে আইন রচনা করা এবং আইন প্রয়োগ, এ দুটি বিষয় এমনই ভিন্ন ধরনের দায়িত্ব যা এক ব্যক্তি বা সংস্থার হাতে সমর্পণ করা যায় না। তেমনি, federative function-টির দায়িত্বও ভিন্ন বিভাগের হাতে থাকা উচিত। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীরণের এই বিষয়টি মন্টেস্কু তাঁর উল্লেখিত গ্রন্থে আরো বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। সমকালীন রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই নীতির প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯)-এর পর বিপ্লবী নায়কগণ রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে যে নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন সেটা এই নীতির উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছিল। ১৭৮৭-৮৯ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ সংবিধান রচনায় উদ্যোগী হলে এই নীতিকে ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সেইজন্য মার্কিন সংবিধানে এই নীতির স্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতালীয় সংবিধানেও এই নীতি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিভিন্ন শাসনতন্ত্রের উপর এই নীতির প্রভাব থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, রাষ্ট্রনীতির ইতিহাসে এই নীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ।

**অনুশীলনী—২**

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মন্টেস্কুর অবদান কী?

## ১২.৩.২ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ

মন্টেস্কুর ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি মার্কিন সংবিধান রচয়িতাদের উপর সুস্পষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাই এই দেশের সংবিধানে আমরা সতর্কতামূলক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির প্রেক্ষিতে ক্ষমতা পৃথকীকরণ তত্ত্বের প্রচলন দেখতে পাই। মার্কিন সংবিধানে রচয়িতারা নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের বিষয়টি যুক্ত করেন ক্ষমতা পৃথিকীকরণ তত্ত্বের সাথে যাতে তত্ত্বটি বাস্তবে আরো ভালো ভাবে কাজ করতে পারে। স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যে কাজ লক ও মন্টেস্কু শুরু করেন তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের ফিলাডেলফিয়া কনভেনশনের মাধ্যমে। মার্কিন সংবিধান রচয়িতারাও মন্টেস্কুর মত প্রেরণা পেয়েছিলেন প্রকৃতির রাজ্যের সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর কাজের নিয়মশৃঙ্খলা পরস্পর নির্ভরশীলতা বিষয় থেকে। মার্কিন সংবিধান রচয়িতাদের হাতেই ক্ষমতা পৃথকীকরণের তত্ত্বটি বাস্তব রূপ লাভ করে। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের তিনটি বিভাগের কাজের যেমন স্বাতন্ত্র্য আছে, তেমনি এই বিভাগ তিনটির মধ্যে সহযোগিতাও লক্ষ্য করা যায় ক্ষমতা ও ভারসাম্যের নীতির অস্তিত্বের ফলে। এখানে রাষ্ট্রপতির হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পিত হলেও তাঁর নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে সেনেটের অনুমোদন অর্জন করতে হয়। যদি রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগ বা কোন প্রমাণিত গুরুতর অন্যায় থাকে, তবে প্রতিনিধি সভা রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র তৈরী করে এবং সেনেটে দু-তৃতীয়াংশের ভোটে সেটি গ্রহণ করলে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হতে পারেন। রাষ্ট্রপতির দ্বারা ঘোষিত শাসনবিভাগীয় নির্দেশ আইনগত পর্যালোচনা (Judicial review)-র মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ক্ষমতাসীন হওয়ার সময়ে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির উপস্থিতিতে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করেন যে, তিনি সংবিধানকে রক্ষা করবেন। এইভাবে তিনি কংগ্রেস ও সুপ্রীম কোর্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। আবার রাষ্ট্রপতি ও সুপ্রীম কোর্ট মার্কিন কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কংগ্রেস কর্তৃক পাস হওয়া বিলে রাষ্ট্রপতি ভেটো প্রদান করতে পারেন। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান-বিরুদ্ধ কোন আইনকে আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে বাতিল করতে পারে। সুপ্রীম কোর্টকেও রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সেনেটের অনুমোদনক্রমে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির সমক্ষে শপথ গ্রহণ করেন। বিচার বিভাগের শক্তিবৃদ্ধির জন্য কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করতে পারে। আবার সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে বিচারকদের পদচ্যুত করাও যেতে পারে।

ইতিমধ্যে মার্কিন সাংবিধানিক ব্যবস্থার মধ্যেও বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। আইন বিভাগ দ্বারা রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি এখন সাংবিধানিক গল্পের মত শোনায়। রাষ্ট্রপতি বৈদেশিক চুক্তির বা নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি আজকাল সহজেই সেনেটের অনুমোদন লাভ করে। ইম্পীচমেন্টের পদ্ধতিটি এত দীর্ঘ এবং জটিল যে বর্তমানে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এই বিষয়টির অস্তিত্বের জন্য আদৌ উদ্বিগ্ন নন। আবার, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার নাম সুপ্রীম কোর্টে তাদের ক্ষমতাকে আরো সম্প্রসারিত করেছে।

## ১২.৪ মূল্যায়ন

আধুনিককালে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মন্টেস্কু প্রচারিত ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির বাস্তব মূল্য ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিভিন্ন দেশের শাসনব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ যে এদের পৃথক করা শুধু অযৌক্তিক নয়, অবাস্তবও বটে। অধ্যাপক ফাইনার মন্তব্য করেছেন যে, এই নীতির বাস্তব প্রয়োগের ফলে শাসন ব্যবস্থায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। ক্ষমতার পৃথকীকরণের ফলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ঈর্ষাপ্রসূত ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পারে। মিল (Mill) এজন্যই মন্তব্য করেছেন যে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বিচ্ছিন্ন হ'লে তাদের মধ্যে ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে শাসন ব্যবস্থায় কর্মকুশলতা ব্যাহত হতে বাধ্য। সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই নীতির আদৌ কোন গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায় না।

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির স্বপক্ষে বলা হয় যে, এই তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রের স্বৈরাচার থেকে রক্ষা করা। কিন্তু দেখা যায় যে, ব্রিটেনে ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতি চালু না থাকা সত্ত্বেও সেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত। আবার কোন কোন দেশে দেখা যায় যে, ক্ষমতার পৃথিকীকরণের নীতি চালু থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষিত হয় না। এই কারণে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকার ক্ষমতাকে পৃথকীকরণের উপর নির্ভর করে না ; নির্ভর করে জনগণের শিক্ষা ও রাজনৈতিক চেতনার উপর। জনগণ তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষায় বদ্ধপরিকর হলে কোন শক্তিই তাদের স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ করতে পারে না। নির্ভীক ও শর্ত জনমতকে এই কারণেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নাগরিক স্বাধীনতা অধিকারের মূলমন্ত্র রূপে বর্ণনা করেছেন।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলসমূহের ব্যাপক প্রভাবের ফলেও ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির গুরুত্ব বহুলাংশে কমেছে। কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে সরকারের আইন বিভাগই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আইন সভার অনুমোদনক্রমেই শাসকবর্গ শাসন কার্য ও বিচারকগণ বিচার কার্য সম্পাদন করেন। বার্কার (Barker)-এর মতে, আধুনিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র বিপুলভাবে প্রসাসিত হবার ফলে শাসন বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে বিচার বিভাগই সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, কারণ এই বিভাগ আইন ও শাসন বিভাগকে সংযত রাখে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে মতভেদ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সরকারের কোন বিভাগই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং প্রত্যেক বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার দ্বারাই শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব। সুতরাং, ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতিটির পূর্ণ প্রয়োগ আধুনিক রাষ্ট্রে সম্ভব নয় ; কেননা, সরকারের তিনটি বিভাগই প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই কারণে, প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল্যবোধ ও মতাদর্শগতভিত্তি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করে। বিশাল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাই সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা, সামঞ্জস্য ও সংহতি না থাকলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার পৃথিকীকরণের নীতিটির আংশিক প্রয়োগ, অর্থাৎ বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার কথা বলা হয়। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগকে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিচার বিভাগ রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করে। সুতরাং সরকারের প্রতিটি বিভাগ একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করে।

**অনুশীলনী—৩**

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির মূল্যায়ণ করো।

## ১২.৫ সারাংশ

বহু প্রাচীনকাল থেকেই ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতির প্রচলন থাকলেও ফরাসীদেশের মন্টেস্কুই এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। তাঁর মতে, সরকারের তিনটি বিভাগ নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে থেকে কাজ করলে এবং এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ না করলে নাগরিক স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে রক্ষিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যাবলী পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, মন্টেস্কুর নীতি বাস্তব ক্ষেত্রে অকার্যকর। তবে, যে উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষমতা পৃথকীকরণের তত্ত্বের প্রচার করেছিলেন তা সার্থক হয়েছিল। ফরাসী রাজতন্ত্রের চরম স্বৈরাচার ও জনগণের দুর্দশার বিরুদ্ধে বিশ্বজনমতকে তিনি জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। ফরাসী বিপ্লব রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে নাগরিক স্বাধীনতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এর পিছনে মন্টেস্কুর অবদান ছিল যথেষ্ট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচয়িতারাও যে এই নীতির দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন সে কথা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে, বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেছে যে, এই নীতির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয়, কাম্যও নয়। তবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা হল ক্ষমতার অপপ্রয়োগ। সুতরাং সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যদি বিচার বিভাগকে সরকারের অন্য দুই বিভাগের প্রভাব ও প্রতিপত্তি থেকে মুক্ত রাখা যায় তবে ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণের সাথে রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যও বাস্তবায়িত হ'তে পারে।

## ১২.৬ উত্তরমালা

**অনুশীলনী—১**

১২.১ অংশ দেখুন

**অনুশীলনী—২**

১২.৩.১ অংশ দেখুন

**অনুশীলনী—৩**

১২.৪ অংশ দেখুন

## ১২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

(1) Alan R. Ball : Modern Politics and Government

(2) J. C. Johari : Comparative Politics

(3) ডাঃ অনাদিকুমার মহাপাত্র ঃ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা।

(4) দেবাশীষ চক্রবর্তী ঃ রাষ্ট্রতত্ত্ব।

# একক—১৩ ❐ সংবিধান ও সংবিধানবাদ

গঠন

১৩.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা
১৩.১ সংবিধান ও সংবিধানবাদ
১৩.২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় সংবিধানের গুরুত্ব
১৩.৩ সংবিধান ও সাংবিধানিক আইন
১৩.৪ রাষ্ট্রীয় সংবিধানের মূল নীতি ও উপাদান
১৩.৫ সংবিধানের সংজ্ঞা ও চরিত্র
১৩.৬ সংবিধানের প্রকারভেদ
১৩.৬.১ লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের গুণাগুণ
১৩.৭ শ্রেষ্ঠ সংবিধানের লক্ষণ ও উপাদান
১৩.৮ সংবিধানের বিকাশ ও বিবর্তন
১৩.৯ অনুশীলনী
১৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

## ১৩.০ উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবনা

চতুর্থ পর্যায়ে চারটি এককের মাধ্যমে রাষ্ট্রপরিচালনায় সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশকরূপে সংবিধানের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব, রাষ্ট্রনায়কদের এবং রাজনীতিবিদ্ ও রাষ্ট্রতাত্ত্বিকদের সংবিধানের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতার প্রবণতাকে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া, এই এককের প্রতিটি পর্বে ক্রমানুসারে সরকারের সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ, বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা, গুরুত্ব ও কার্যাবলী, রাষ্ট্রতত্ত্বে গোষ্ঠীবাদ, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সংজ্ঞা ও প্রকৃতি এবং উদারনৈতিক গণতন্ত্রে তাদের ভূমিকা ও কার্যাবলী আলোচনা করা হয়েছে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির কার্যপদ্ধতির নির্ধারকসমূহ এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক দলসমূহের সম্পর্কের বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট এককগুলির আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বলাভ করেছে।

## ১৩.১ সংবিধান ও সংবিধানবাদ

রাষ্ট্রপরিচালনায় সংবিধানের ভূমিকা ও গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। সংবিধানের এই প্রয়োজনীয়তার কারণ বহুবিধ। প্রথম উদ্দেশ্য হ'ল—কতকগুলি মৌলিক নীতি ও নির্দেশের সহায়তায় সরকারের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখা। দ্বিতীয়ত, একটি সংবিধান প্রত্যেক ব্যক্তি-নাগরিকের পক্ষ থেকে সরকারকে সংযত রাখে এবং এই সংযতকরণ প্রক্রিয়ার সহায়তায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে। বিখ্যাত

সংবিধান বিশেষজ্ঞ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী শূল্‌জ (Schulze) বলেছেন যে, প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি সংবিধান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এই সংবিধান হবে নীতি ও নির্দেশের সমষ্টি—যার সাহায্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে আইনগত সম্পর্ক নির্ধারিত হবে এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে। সংবিধানবিহীন রাষ্ট্র (শূল্‌জের মতানুসারে) একটি অচিন্ত্যনীয় বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেলিনেকও (Jellinek) ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করেন। তিনিও মনে করেন যে, প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য একটি সংবিধান অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। বস্তুত প্রতিটি রাষ্ট্রই একটি করে সুলিখিত ও সুসংবদ্ধ সংবিধানের অধিকারী হয়। এমনকি স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থারও সংবিধান প্রয়োজনীয়। সংবিধানবিহীন রাষ্ট্র বস্তুত নৈরাজ্যেরই নামান্তর।

সংবিধানের গুরুত্ব নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গেই সংবিধানের সংজ্ঞা নির্দেশকরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সংবিধানের সংজ্ঞা নির্দেশকরণের প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করতে পারেন না। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে সংবিধান কী? উলসীর (Woolsey) মতে সংবিধান হচ্ছে সেই সমস্ত নীতিসমূহের সমষ্টি—যাদের সাহায্যে শাসকের ক্ষমতা শাসিতের অধিকার এবং দুইয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। বোভার (Bouvier)-এর মতে সংবিধান হ'ল রাষ্ট্রপরিচালনার মৌল নীতি। জে. মিলার (J. Miller)-এর মতো মার্কিন রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক মন করেন যে, সংবিধান হ'ল একটি লিখিত দলিল—যেখানে সরকারের ক্ষমতাকে লিখিত সীমিত ও সুনির্দিষ্ট করা হয়। এইভাবে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠবার সূচনাপর্ব থেকে সংবিধানের সংজ্ঞা, চরিত্র, কার্যকারিতা ও ভূমিকা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আলোচনা ও বিতর্ক করেছেন। এই বিতর্ক থেকেই রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ও চিন্তায় সংবিধানবাদের উদ্ভব হয়েছে।

## ১৩.২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় সংবিধানের গুরুত্ব

ফলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অপরিহার্য অনুষঙ্গ একটি সুলিখিত সংবিধান। সুলিখিত সংবিধান সুনির্দিষ্ট হয়। এই সংবিধান কাগজে কলমে লিখিত ও দলিলবদ্ধ হয়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিকরা এবং আইনবিদ্, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও রাষ্ট্রতাত্ত্বিকেরা (Political theorists) দেশের সাংবিধানিক আইন ও পরিকাঠামোর স্বরূপ বুঝতে সক্ষম হন। তবে ভাষাও অধস্তরের নাগরিকদের পক্ষে সহজবোধ্য হয়। সাধারণত সংবিধান অতি-সংক্ষিপ্ত ও অতি বিস্তৃত—কোনটাই হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অতি বিস্তৃত সংবিধান সাধারণ নাগরিকদের বোধগম্য হয় না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষেও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই সংবিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করা সম্ভব হয় না। বর্তমান বিশ্বে ক্ষুদ্রতম সংবিধানের দৃষ্টান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান ও বৃহত্তম সংবিধানের নজীর ভারতীয় সংবিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আলোচনা ও গবেষণার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যার সৃষ্টি করে না। গত দুই শত বৎসরে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের ফলে সংবিধান একটি সুশৃঙ্খল পাঠ (Disciplined Study) রূপে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আগ্রহের বিষয় হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংবিধানের তুলনামূলক আলোচনা (Comparative Government) এই সুশৃঙ্খল পাঠের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। একটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত সংবিধান সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনের পরিপূরক হয়।

## ১৩.৩ সংবিধান ও সাংবিধানিক আইন

সংবিধানের ব্যাপক প্রসার ও সাংবিধানিক সমস্যাকে উপজীব্য করে রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক তত্ত্বে ও ধারণায়

সাংবিধানিক আইনের উদ্ভব ঘটেছে। সাংবিধানিক আইনের সংজ্ঞা কি? বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদ্বয় ওয়েড এবং ফিলিপ-এর (Wade & Philip)-মতে, সাংবিধানিক আইনের কোন ধরাবাঁধা সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না।

আইনের সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা যদি বুঝতে হয় তবে সাংবিধানিক আইন বলতে বুঝায় শাসন পরিচালনার জন্য প্রণীত আইন। এর সঙ্গে বহুকাল প্রচলিত প্রথাগুলিও অঙ্গীভূত, যে প্রথাগুলির সাহায্যে সরকারী পরিকাঠামোর বিভিন্ন অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ ডাইসী (Dicey)-র মতে, ইংলন্ডবাসীর ধারণায় সাংবিধানিক আইন বলতে সেই সমস্ত আইনকেই বোঝায় যেগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রে প্রযুক্ত সার্বভৌম ক্ষমতার বন্টন ও প্রয়োগকে প্রভাবিত করে। বোভার (Bovier)-এর মতে, সাংবিধানিক আইন হ'ল রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক আইন। যে সমস্ত রাষ্ট্রের লিখিত সংবিধান আছে সে সমস্ত রাষ্ট্রে সাংবিধানিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব এবং সেখানে সেই পার্থক্য নির্ণয় করতে হয়। সাধারণ আইন সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে পাস করা হয়। সাংবিধানিকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। ঐ সংবিধান ১৯৪৬ সালে বিশেষভাবে গঠিত গণপরিষদ কর্তৃক রচিত হয় এবং ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে প্রচলিত হয়। এই সাংবিধানিক আইন অনুসারেই ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রথম সারা ভারতে প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতেই গণতান্ত্রিক ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের মত পৃথিবীর অনেক দেশই এখন সংবিধান-নির্ভর এবং এর ফলে সে সমস্ত দেশে সাংবিধানিক আইনের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান।

## ১৩.৪ রাষ্ট্রীয় সংবিধানের মূলনীতি ও উপাদান

পৃথিবীর সব দেশের সংবিধানই কিছু মূলনীতির দ্বারা নির্ধারিত ও পরিচালিত হয়। এই অপরিহার্য মূলনীতিগুলিই একটি সংবিধানকে আদর্শ সংবিধানে রূপান্তরিত করে। সংবিধান সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। সংবিধানের ভাষা প্রাঞ্জল ও জনসাধারণের নিকট সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন। সংবিধান শুধুমাত্র বিশেষজ্ঞ ও আইনজ্ঞ সুপণ্ডিতদের নিকট বোধগম্য হ'লে চলবে না। পৃথিবীর অনেকেই দেশেই সংবিধানকে অভিজাত সমাজের জন্য নির্দিষ্ট সাহিত্য বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু জনগণের সংবিধানকে সেটা হলে চলবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৩৬ সালে যে সংবিধান প্রবর্তিত হয় সেই Stalin Constitution রচনার কাজ সম্পূর্ণ করতে বিশ বৎসর সময় লেগেছিল। সংবিধানের মূল খসড়াটি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় ছাপিয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক প্রচার করা হয়। জনগণের কাছ থেকে সংশোধনী প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। কয়েক লক্ষ সংশোধনী প্রস্তাব আসে। তার থেকে প্রায় লক্ষ্য

াধিক প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তার মূলনীতিগুলি সংবিধানের অঙ্গীভূত হয়। সেইজন্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানকে যথার্থই জনগণের সংবিধান বলে দাবী করা হয়। সংবিধান প্রণয়নে বৃহৎ জনগণের ব্যাপক অংশীদারিত্ব সুনিশ্চিত করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষে সেই সংবিধানের সংশোধন ও সংযোজনের জন্য অধিক বেগ পেতে হয় না। তা ছাড়া সংশোধন ও সংযোজনের খুব বেশী প্রয়োজনও হয় না। সংবিধানের ব্যাপকতা, গভীরতা, সুস্পষ্টতা ও সহজবোধ্যতা সুনিশ্চিত করাই সংবিধান রচনার মূলনীতি ও উপাদান বলে গণ্য হয়।

## ১৩.৫ সংবিধানের সংজ্ঞা ও চরিত্র

আগেই বলা হয়েছে, নানা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সংবিধানের নানা সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। স্যার জেম্‌স ম্যাকিনটস (Sir James Macintosh) বলেছেন একটি রাষ্ট্রের সংবিধান বলতে সেই সমস্ত লিখিত ও অলিখিত মৌলিক অনুষ্ঠানকে বোঝায় যা শাসন ক্ষমতায় উচ্চপদাধিকারীদের অধিকারকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং জনসাধারণের অত্যাবশ্যকীয় অধিকার ও সুযোগ সুবিধাকে স্বীকৃতি ও সুরক্ষা প্রদান করে। ডঃ ফাইনার (Dr. Finer)-এর মতে, রাষ্ট্র এক মানবিক সংহতি (Human grouping)-র ফলশ্রুতি যেখানে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান ও পরিকাঠামোর এক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই ক্ষমতাকেন্দ্রিক পারস্পরিক সম্পর্ক রাষ্ট্রের সংবিধানে অভিব্যক্তি লাভ করে। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) রাষ্ট্রের সংবিধানকে আইন ও প্রথার সমষ্টি বলে অভিহিত করেছেন এবং রাষ্ট্র এই আইন ও প্রথার সমষ্টির দ্বারা পরিচালিত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ডঃ হোয়্যার (Dr. Wheare) বলেছেন যে, সংবিধান হচ্ছে সেই আইনের সমষ্টি যার সাহায্যে ও যার মাধ্যমে সরকারী ক্ষমতা প্রযুক্ত ও কার্যকরী হয়।

ভারতের সংবিধানের সংজ্ঞা ও চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গণপরিষদে পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন যে, যদিও ভারতের সংবিধানকে আমরা একটি স্থায়ী ও দৃঢ়সংবদ্ধ দলিলরূপে দেখতে চাই তবুও মনে রাখা প্রয়োজন যে, সংবিধানের স্থায়িত্ববিধান সম্ভব নয়। কারণ সংবিধান জনগণের নিরবচ্ছিন্ন ও গতিশীল আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।

১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর নতুন দিল্লীতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। মুসলীম লীগের সদস্যদের বাদ দিলে ২০৭ জন প্রতিনিধি ঐ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। ৯ই ডিসেম্বর থেকে ২৩শে ডিসেম্বর পর্যন্ত গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন চলে। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত গণপরিষদের স্থায়ী নিয়মাবলী (Permanent rules) তৈরী না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইনসভার (Central Legislative Assembly) নিয়মপদ্ধতি ইত্যাদি গণপরিষদের পরিচালনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সামান্য আলোচনার পর নেহরুর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ১২ই ডিসেম্বর সভার কার্যবিবরণী সংক্রান্ত কমিটি (The Committee on Rules and Procedures) নির্বাচিত হয়। ১৩ই ডিসেম্বর নেহরু ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। ঐ প্রস্তাবে ভারতবর্ষকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। ঐ ঘোষণাই পরে সংবিধানের প্রস্তাবনার (Preamble) অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ভারতের সংবিধানের বুনিয়াদ রচিত হয়।

## ১৩.৬ সংবিধানের প্রকারভেদ ঃ লিখিত ও অলিখিত

সংবিধানকে সাধারণত সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় এবং লিখিত ও অলিখিত এই চার ভাগে ভাগ করা হয়। লিখিত সংবিধানে সংবিধানের ব্যবস্থাবলী ও বিধি বিধান একটা লিখিত দলিলে সন্নিবন্ধ করা হয়। জেমসন (Jameson)-এর মতে, লিখিত সংবিধান একটি সচেতন ও সক্রিয় প্রয়াসের ফলশ্রুতি। সরকারকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী ও বিধি-বিধানকে সুসংহত ও সুবিন্যস্ত করার প্রয়াসের ফলশ্রুতি

এই লিখিত সংবিধান। লিখিত সংবিধান একটি নির্দিষ্ট তারিখে ও নির্দিষ্ট দলিলে নথিবদ্ধ করা যায়। ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে এর নজীর হিসেবে ধরা যেতে পারে। লিখিত সংবিধান একাধিক দলিলে একাধিক তারিখে লিপিবদ্ধ করা যায়। ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার সংবিধান এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। যখনই কোনও দেশে লিখিত সংবিধান চালু হয় তখনই সংশ্লিষ্ট দেশের সাধারণ আইন (Ordinary Laws) ও সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law)-এর মধ্যে পার্থক্যটি সুস্পষ্টরূপে দেখা দেয়। লিখিত সংবিধান সংশোধনের জন্য বিশেষ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়।

অলিখিত সংবিধানের চরিত্র বিশ্লেষণ করে জেমসন (Jameson) বলেছেন যে অলিখিত সংবিধান প্রধানত বহুকাল প্রচলিত প্রথা ও বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত (Judicial Decisions)-কে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। অলিখিত সংবিধানও আইন ও সংবিধান বিশারদদের অভিজ্ঞতার ফল। অলিখিত সংবিধান কোনও সুনির্দিষ্ট দলিলে সন্নিবদ্ধ হয় না বটে ; কিন্তু কার্যকারিতাও বিশ্বাসযোগ্যতার দিক থেকে লিখিত সংবিধানের চেয়ে কোনও অংশে কম মূল্যবান নয়।

বৃটিশ সংবিধান অলিখিত এবং কার্যকারিতার বিচারে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান। বৃটিশ সংবিধান বিবর্তনের দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ৫০০ বছরে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। বৃটিশ সংবিধান সম্পর্কে ডঃ আইভর জেনিংস (Dr. Ivor Jenuings) বলেছেন যে, তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের তাগিদে উদ্ভূত এই সংবিধান পরবর্তীকালে পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিরক্ষা করে আরও ব্যাপক ও প্রয়োজনে ভিন্নতর উদ্দেশ্যসাধনের কাজে লেগেছে। নিত্য নতুন উদ্ভাবনের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই সংবিধান বিবর্তিত হয়েছে। অলিখিত সংবিধানকে সংবিধান বিশেষজ্ঞরা জ্ঞান, চিন্তা ও অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি বলে উল্লেখ করেছেন। স্যার জেমস্ ম্যাকিনটস (Sir James Mcintosh) বলেছেন যে, সংবিধান গড়ে ওঠে, সংবিধান তৈরী করা হয় না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য আকৃতিগত ; প্রকৃতিগত নয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, প্রতিটি লিখিত সংবিধানেই কিছু অলিখিত বক্তব্য থাকে। মূলত, প্রথাগত আইন ও নজীরগুলিই এই অলিখিত অংশের উপাদানরূপে গণ্য হয়। সেইজন্য ডঃ গার্ণার (Dr. Garner) সংবিধানের এই লিখিত ও অলিখিতের বিভাগীকরণকে (Classification) বিভ্রান্তিকর ও অবৈজ্ঞানিক বলে মন্তব্য করেছেন।

## ১৩.৬.১ লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের গুণাগুণ

লিখিত সংবিধানের সবচেয়ে বড় গুণ এই যে এই সংবিধান অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট (very definite) ও সুস্পষ্ট। সাধারণ মানুষ লিখিত সংবিধানের মারফৎ কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিচালিত সরকারের মৌলনীতি, সাংগঠনিক পরিকাঠামো, ক্ষমতা ও পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্যক পরিচিতি লাভ করে। লিখিত দলিলকে বোঝা জনগণের পক্ষে তুলনামূলকভাবে সহজ। তাছাড়া, লিখিত সংবিধানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সুস্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট ও ব্যাখ্যাত থাকে। লিখিত সংবিধানের মারফৎ জনসাধারণ আগাম জানতে পারেন তাঁরা কিভাবে শাসিত হতে চলেছেন।

লিখিত সংবিধানের সবচেয়ে বড় ত্রুটি হ'ল এই যে, এই সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হ'তে বাধ্য। লিখিত

সংবিধানকে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংশোধন করা (Amendment) সব সময়ে সম্ভব না-ও হ'তে পারে। সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত এমন হ'তে পারে যে, সেখানে কোনও প্রথা বা নজীর সৃষ্টি হওয়া কঠিন। এই অবস্থায় লিখিত সংবিধান দেশের পরিবর্তিত প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হ'তে পারে।

অলিখিত সংবিধানের সবচেয়ে বড় গুণ এই যে, এই সংবিধান সাধারণভাবে নমনীয় হ'বার সম্ভাবনা থাকে। সংবিধানকে বাতিল করার প্রয়োজন হয় না, যেহেতু এই সংবিধান সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে পারে। যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় এটা সবচেয়ে বেশী প্রমাণিত হয়। তাছাড়া, সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং সেই পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সংবিধানেরও বিকাশ ও বিবর্তন ঘটে। অলিখিত সংবিধানের ক্ষেত্রে এটা খুবই সহজ কাজ। কারণ, অলিখিত সংবিধানের পক্ষে সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে পরিবর্তিত হওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ।

অলিখিত সংবিধানের সবচেয়ে গুরুতর ত্রুটি হ'ল এই যে সংবিধান অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট। সাধারণ মানুষ দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে সব সময় বুঝতে সক্ষম না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে একজন নাগরিকের পক্ষে এমন কোনও দলিলের নজীর সামনে হাজির করা সম্ভব নয়—যার সাহায্যে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা ও তার পরিকাঠামোকে বুঝতে সক্ষম হয়। অলিখিত সংবিধানকে অনুধাবন করতে যে উচ্চমানের রাজনৈতিক জ্ঞান ও চেতনা থাকা প্রয়োজন সেটা সব সময় সব দেশের নাগরিকের পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে। লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) যথার্থই বলেছেন যে, অলিখিত সংবিধান স্বভাবতই অস্থিতিশীল (unstable) এবং এই সংবিধানে সুসংহতি ও স্থায়িত্বের (Solidarity and permanence) কোনও নিশ্চয়তা নেই।

## ১৩.৭ শ্রেষ্ঠ সংবিধানের লক্ষণ ও উপাদান

একটি আদর্শ সংবিধানের কিছু সুনির্দিষ্ট গুণাবলী আছে। সংবিধানকে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য হ'তে হবে। একটি সুনির্দিষ্ট দলিলে এই সংবিধান লিপিবদ্ধ থাকবে ; যাতে করে দেশের প্রতিটি মানুষ তার দেশের সাংবিধানিক ব্যবস্থা ও পরিকাঠামোকে সহজে বুঝতে পারে। সংশ্লিষ্ট দলিলের ভাষা দুর্বোধ্য হ'লে চলবে না। সংবিধান অতি সংক্ষিপ্ত বা অতি বিস্তারিত কোনটাই হ'লে চলবে না। যদি সংবিধান আকারে ও বিষয়বস্তুতে অতি বৃহৎ হয়, তবে সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটাকে অনুধাবন করা কঠিন হবে। সেক্ষেত্রে অনাগত প্রজন্মের পক্ষে সুবৃহৎ সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন ঘটিয়ে তাকে তাদের পরিবর্তিত প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। একই সঙ্গে সংবিধান অতি সংক্ষিপ্ত হ'লে চলবে না। অতি সংক্ষিপ্ত সংবিধান অতি বৃহৎ সংবিধানের মতই সমানভাবে ক্ষতিকর। আদর্শ সংবিধানকে অত্যন্ত দুষ্পরিবর্তনীয় হ'লে চলবে না—তাহলে তাকে পরিবর্তন করা দুঃসাধ্য হবে। আবার সংবিধান ততটা সুপরিবর্তনীয় হওয়াও বাঞ্ছনীয় নয় যাতে শাসক শ্রেণীর অকারণ হস্তক্ষেপে তার মূলনীতি থেকে বিচ্যুত হ'তে পারে। লর্ড ব্রাউহাম (Lord Broughum)-এর মতে সংবিধান বিকশিত ও বিবর্তিত হবে (grow and evolve); সংবিধান হবে মৌল চরিত্রসম্পন্ন পরিপক্ক এবং সহনশীল।

ভারতের সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার সময় গণপরিষদে পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন যে, যদিও আমরা আমাদের

সংবিধানে স্থায়ী ও দৃঢ় সংবদ্ধ করে তুলতে চাই, তবুও আমাদের মনে রাখতে হবে যে সংবিধানে স্থায়িত্ব বলে কোনও উপাদান নেই।

## ১৩.৮ সংবিধানের বিকাশ ও বিবর্তন

পৃথিবীর যে কোনও রাষ্ট্রের সংবিধানে নিরবিচ্ছিন্ন বিকাশ ও বিবর্তনের প্রক্রিয়া চলে। সংবিধান যে উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক তা হ'ল সংশ্লিষ্ট দেশের জনসাধারণের স্থায়ী কল্যাণসাধন। সংবিধানের বিকাশ ও বিবর্তন আপনা-আপনি ঘটে না। এই প্রক্রিয়ার পিছনে রাষ্ট্রের রাজনীতিবিদ্ শাসক ও জনগণের সক্রিয় প্রয়াস ক্রিয়াশীল থাকে।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, প্রত্যেক দেশেই কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু প্রথার সৃষ্টি হয়। এই প্রথাগুলি সংবিধানের বিশুষ্ক আইনী কাঠামোতে প্রাণসঞ্চার করতে খুবই সাহায্য করে। যদিও প্রথাগুলি (Conventions) লিখিত নয়, তবুও সেগুলি সংবিধানের অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয় এবং এইগুলি যাতে সংবিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথাযোগ্য মর্যাদালাভ করতে পারে তার জন্য সব রকম প্রয়াস নেওয়া হয়।

সংবিধানের বিকাশ ও বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সংশোধনের (amendment) ভূমিকা অসাধারণ। বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যাও সংবিধানের বিকাশ ও বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। অনেক রাষ্ট্রেই সংবিধান সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার ব্যাখ্যার ভিতর দিয়ে বিকশিত হয়। সংবিধানের বিভিন্ন ধারাকে দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয় যেভাবে ব্যাখ্যা করে সেইভাবেই সেটা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় সমাজে আইনী প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতিলাভ করে। এটা সর্বজনবিদিত যে, ভারতের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত মৌলিক অধিকারের চরিত্র নির্ধারিত হয়েছে অনেকটাই ভারতের সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত ও ব্যাখ্যার দ্বারা। সংবিধানের ব্যাখ্যা উদারনৈতিক না কঠোর হবে—সেটা নির্ভর করবে প্রধানত সুপ্রীম কোর্টের ব্যাখ্যার উপরই। বিচার বিভাগের ব্যাখ্যা বা রায়দানের ফলশ্রুতিতে একটা দেশের সংবিধানের মূল চরিত্রটাই পাল্টে যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মিঃ হিউজেস (Mr. Huges) বলেন যে, বিচারপতিরা যেমন সংবিধানের আজ্ঞাবাহক তেমনি সংবিধান কেমন হবে তা বলার অধিকারীও বিচারপতিরাই ''('We are under the Constitution but the Constitution is what the Judges say it is')''। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারপতি মিঃ ফ্রাঙ্ক ফুর্টার বলেছেন যে, দেশের সর্বোচ্চ আদালতই দেশের সংবিধান (Supreme Court is the Constitution)।

সংবিধানকে বিকশিত করতে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হ'ল তার সংশোধন প্রক্রিয়া। কোনও সংবিধানই চিরস্থায়ী হয় না। সংবিধান সুদূর অনাগত দিনের প্রজন্মের জন্য সব ব্যবস্থা করে যেতে পারে না। এটা আশা করা অন্যায় হবে যে, কোনও দেশের সংবিধান রচয়িতারা সকলেই হবেন ত্রিকালদর্শী এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রয়োজনের পরিপূরক সব ব্যবস্থাই সংবিধানে রেখে যাবেন।

## ১৩.৯ অনুশীলনী

ক। (১) নিম্নলিখিত কোন্ দেশের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় ঃ
ব্রিটেন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

(২) নিম্নলিখিত কোন্ দেশের সংবিধান বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সংবিধান ঃ
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারতবর্ষ।

খ। (১) আধুনিক রাষ্ট্রে সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

(২) সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণ কি?

(৩) সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের উল্লেখযোগ্য গুণ কি?

গ। (১) উদাহরণসহ সাধারণ আইন ও সাংবিধানিক আইনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

(২) একটি রাষ্ট্রের সংবিধানের মৌল উপাদানগুলি কি কি?

(৩) একটি আদর্শ সংবিধানের অপরিহার্য লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

(৪) সংবিধান সংশোধনের একটি সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতি নির্দেশ করুন।

## ১৩.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। ভারতের সংবিধান পরিচয়—ড় দুর্গাদাস বসু
[বঙ্গানুবাদ ঃ ড. রমেন মজুমদার (১৯৯৪)]

২। Political Theory-V.D. Mahajan (4th Edn. 1988)

# একক—১৪ ❐ সরকার ও তার বিভিন্ন রূপ

গঠন

১৪.০ উদ্দেশ্য
১৪.১ প্রস্তাবনা
১৪.২ সরকারের শ্রেণীবিভাগ
১৪.৩ সরকার বা শাসনব্যবস্থার শ্রেণী বিভাজনের সমস্যা
১৪.৪ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা শ্রেণী বিভাজনের সমস্যা
১৪.৪.১ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ
১৪.৫ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা
১৪.৫.১ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ
১৪.৬ আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রিকরণের প্রবণতা
১৪.৭ অনুশীলনী
১৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

## ১৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি বুঝতে পারবেন ঃ

- সরকার কাকে বলে ও তার শ্রেণীবিভাগ
- এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পার্থক্য
- আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রিকরণের প্রবণতার ধরণ।

## ১৪.১ প্রস্তাবনা

সরকার হ'ল একটি প্রতিষ্ঠান বা যন্ত্র যার মাধ্যমে বিমূর্ত রাষ্ট্র তার ইচ্ছাকে গঠন ও কার্যকর করে। বাস্তবিক সরকারই রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে আইনে রূপান্তরিত করে এবং আইনের সাহায্যে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করে। যাদের ওপর রাষ্ট্র পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে তাদের সমষ্টিগতভাবে সরকার বা শাসনব্যবস্থা বলা হয়। সংক্ষেপে সরকার বলতে সাধারণত আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগকেই বোঝায়। এক কথায়, সরকার হ'ল রাষ্ট্রের একটি সংস্থা বা যন্ত্র। রাষ্ট্রবিদ্ গার্ণার মনে করেন, সরকার হ'ল একটি কার্যনির্বাহী মাধ্যম বা যন্ত্র যার মাধ্যমে সরকারের সাধারণ নীতি নির্ধারিত হয় এবং যার দ্বারা সাধারণ কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় ও সাধারণ স্বার্থ সাধিত হয় (Government is the agency or machinery through which common policies are determined and by which common affairs are regulated and common interests promoted.)।

## ১৪.২ সরকারের শ্রেণীবিভাগ

সরকার বা শাসনব্যবস্থা কাঠামো, প্রকৃতি কার্যপদ্ধতি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সকল রাষ্ট্রে এক রকম নয়। আর এই কারণে সরকার বা শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করা অত্যন্ত জরুরী। বস্তুত, এই শ্রেণীবিভাগের কাজটি অতি প্রাচীনকাল থেকেই রাষ্ট্র-দার্শনিকরা করে আসছেন। তাঁরা মূলত দু'টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে সরকার বা শাসনব্যবস্থাগুলিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করেছেন। এর একটি হ'ল শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির সংখ্যা অনুযায়ী, যার সেরা উদাহরণ অ্যারিস্টটলের শ্রেণীভাগ। অন্যটি হ'ল, রাষ্ট্র বা সরকারের সংগঠনের ধরন বা রূপের ভিত্তিতে, যার অন্যতম নিদর্শন হ'ল রাষ্ট্রবিদ ম্যারিয়ট (Marriot) বা লীকক (Leacock) অনুসৃত পদ্ধতি।

সরকার বা শাসনব্যবস্থার প্রাচীনতম শ্রেণীবিভাগের উদাহরণ প্লেটো ও অ্যারিস্টটল-এর শ্রেণীবিভাগ। প্লেটো তাঁর 'স্টেটসম্যান' এ তিন ধরনের সরকারের কথা বলেছেন এবং জ্ঞান বা আইনের প্রতি আনুগত্যকে এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি হিসেবে ধরেছেন। তাঁর কথামত, সরকারের প্রথমটি হ'ল রাজতন্ত্র যা হ'ল একটি আদর্শ শাসনব্যবস্থা, কারণ এখানে জ্ঞানই সার্বভৌম ও শাসন পরিচালিত হয় যুক্তির দ্বারা। দ্বিতীয়টি হ'ল অভিজাততন্ত্র যেখানে আইনের প্রয়োজন হয় এবং সে আইন মান্যও হয়, কিন্তু যুক্তি-বুদ্ধির সার্বভৌমত্ব থাকে না। আর তৃতীয় ধরনটি হ'ল গণতন্ত্র বা তাঁর বিচারে অজ্ঞানের রাজত্ব, কারণ সেখানে আইনের অস্তিত্ব থাকে কিন্তু মান্য করা হয় না।

অন্যদিকে অ্যারিস্টটল তাঁর 'পলিটিক্স' গ্রন্থে শাসনব্যবস্থার যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তার অনেকটাই প্লেটো অনুসৃত পদ্ধতি। অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ দু'টি বিষয় নির্ভরশীল ; তার একটি শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির সংখ্যা এবং অন্যটি রাষ্ট্রের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলেন, অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগের দ্বিতীয়টি হ'ল মূল মানদণ্ড প্রথমটি অর্থাৎ শাসকের সংখ্যার ভিত্তিটি ছিল অপেক্ষাকৃত গৌণ। এই দুটি মানদণ্ডের সাহায্যে সমসাময়িক সব শাসনব্যবস্থাকে শ্রেণীবিভক্ত করে অ্যারিস্টটল দেখিয়েছিলেন সরকার বা শাসনব্যবস্থা ছয় ধরনের—(১) রাজতন্ত্র (Monarchy) ঃ যেখানে শাসনকর্তৃত্ব একজনের হাতে ন্যস্ত থাকে, কিন্তু তা পরিচালিত হয় সবার কল্যাণে আর তার জন্য এটি হ'ল, অ্যারিস্টটলের ধারণায়, সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা ; (২) স্বৈরতন্ত্র (Tyranny) ঃ যা আসলে রাজতন্ত্রের বিকৃত রূপ, যেখানে শাসনকর্তৃত্ব একজনের হ'লেও তা পরিচালিত হয় তার নিজের স্বার্থেই ; (৩) অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) ঃ এই শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা কিন্তু তার লক্ষ্য সবার কল্যাণ, তাই অ্যারিস্টটলের কথায় এটি একটি উত্তম শাসনব্যবস্থা ; (৪) ধনিকতন্ত্র (Oligarchy) ঃ যা অভিজাততন্ত্রের বিকৃত রূপ, যেখানে কতিপয় ব্যক্তি শাসনক্ষমতা দখল করে এবং তাকে তাদের গোষ্ঠীস্বার্থ সিদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করে ; (৫) গণতন্ত্র (Polity) ঃ যেখানে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে সমগ্র রাজনৈতিক সমাজের হাতে এবং তা সবার স্বার্থে পরিচালিত হয় ; এবং (৬) জনতাতন্ত্র (Democracy) ঃ যা আসলে গণতন্ত্রের বিকৃত রূপ। এই ব্যবস্থায় ক্ষমতা বহুজনের হাতে ন্যস্ত থাকলেও তা কেবল শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থে পরিচালিত হয়।

অ্যারিস্টটল অনুসৃত শ্রেণীবিভাগটি দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে নির্দেশিকার কাজ করেছে। পরবর্তীকালে ম্যাকিয়াভেলি (Machiavelli), বোঁদা (Bodin), হবস (Hobbes) প্রমুখ অ্যারিস্টটলের 'সংখ্যার ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীবিভাগের মূল নীতিটিকে গ্রহণ করে শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন। অবশ্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী লেখক মঁতেস্কু (Moutesqaiu) একই ধরনের এক শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন। তাঁর কথায়, সরকার মূলত তিন ধরনের—(১) প্রজাতন্ত্র (Republic) ঃ যার দুটি মুখ্য রূপ—গণতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্র ; (২) রাজতন্ত্র (Monarchices) ঃ যা মূলত ইউরোপীয় দেশগুলির রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং (৩) স্বৈরতন্ত্র (Despotism) ঃ যে ব্যবস্থা প্রধানত প্রাচ্যের দেশগুলির বৈশিষ্ট্য।

তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা নতুন করে সরকারের শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সম্ভবত, নতুন ধরনের শাসনব্যবস্থার উদ্ভব ছিল এর কারণ। রাষ্ট্রবিদ বার্জিস (J. W. Burgess) তাঁর Political Science and Constitutional Law গ্রন্থে একটি নতুন শ্রেণীবিভাগের কথা বলেন। আধুনিক শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে বার্জিস চারটি মানদণ্ড ব্যবহার করেন ; সেগুলি হ'ল—(১) রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে একাত্মতা, (২) শাসক পদের প্রকৃতি, (৩) আইন ও শাসনবিভাগের সম্পর্ক এবং (৪) ক্ষমতার বন্টন। প্রথম মানদণ্ডের সাহায্যে তিনি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দ্বিতীয়টির সাহায্যে প্রজাতান্ত্রিক ও বংশগত শাসনক্ষমতার মধ্যে, তৃতীয়টির দ্বারা সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থার মধ্যে এবং শেষেরটিকে ব্যবহার করে এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্যগুলি উপস্থাপনের চেষ্টা করেন।

তবে সরকারের আধুনিক শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিদ ম্যারিয়ট (Sir John A. R. Marriot)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর শ্রেণীবিভাগ আধুনিক ও বিস্তৃত। মূলত তিনটি মাপকাঠির সাহায্যে তিনি সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেন। প্রথমটি হ'ল ক্ষমতা বন্টনের অনুসৃত নীতির ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থার দ্বৈত বিভাজন—এককেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয়টি সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি মোতাবেক সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনব্যবস্থা। আর তৃতীয়টির ভিত্তি আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক—যার ফলশ্রুতি সরকারের তিনটি বিভাজন ঃ স্বৈরতন্ত্র, যেখানে শাসন বিভাগের নিরঙ্কুশ আধিপত্য সংসদীয় বা মন্ত্রীপরিষদ চালিত যেখানে আইনগত সন্দেহাতীত প্রাধান্য এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার যেখানে আইনসভা ও শাসনবিভাগ পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

ম্যারিয়টকে অনুসরণ করে রাষ্ট্রবিদ লীকক (Dr. Stephen Leacock) সরকারের যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বীকৃতি লাভ করেছে। লীকক প্রথমেই সব ধরনের শাসনব্যবস্থাকে দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—স্বৈরতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক। এরপর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে তিনি দু'ভাগে ভাগ করেছেন—সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র। আবার এর প্রত্যেকটিকে ক্ষমতা বন্টনের প্রকৃতির ভিত্তিতে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়। লীককের মতে, এই দু'টি ব্যবস্থারও আবার দু'টি রূপ—সংসদীয় বা মন্ত্রীসভা চালিত ও রাষ্ট্রপতি চালিত সরকার।

তবে, লীকক কর্তৃক উত্থাপিত ছকটি ইদানিংকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আর গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। এর অনেকগুলি কারণ আছে। কারণগুলির একটি হ'ল, সাম্প্রতিককালে আরও নানা ধরনের শাসনব্যবস্থা দেখা দিয়েছে, যেগুলি লীককের ছকের মধ্যে ছিল না। একটি উদাহরণ বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে পারে। লীকক প্রথমেই সরকারকে স্বৈরতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক—এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন এবং তারপর গণতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ করেছেন ; কিন্তু স্বৈরতন্ত্র বা আধুনিক পরিভাষায় নায়কতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনকে উল্লেখ করেন নি। আর একটি উদাহরণ হ'ল লীককের আলোচনায় সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বা তার কোনও ধরনই স্থান পায়নি।

যাই হোক, লীককের ছককে ভিত্তি করে বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগের জন্য একটি বিস্তৃত ছক নির্মাণ করা যায়। প্রথমত, প্রকৃতির দিক থেকে সরকার তিন ধরনের হ'তে পারে—এক, নায়কতান্ত্রিক বা

স্বৈরতান্ত্রিক ; দুই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ; এবং তিন সমাজতান্ত্রিক। দ্বিতীয়ত, এইসব সরকারের আবার বিভিন্ন রূপ থাকতে পারে এবং দায়বদ্ধতা, ক্ষমতার বন্টন ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ ইত্যাদির ভিত্তিতে উল্লিখিত রূপগুলিকে শ্রেণীবিন্যস্ত করা যায়। যেমন, নায়কতন্ত্র দু'ধরনের হয়—(১) সামরিক নায়কতন্ত্র এবং (২) সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী নায়কতন্ত্র। আবার গণতন্ত্র ও এককেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীক, সংসদীয় বা মন্ত্রীসভাচালিত ও রাষ্ট্রপতি পরিচালিত হ'তে পারে। সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ধরন দুটি হ'তে পারে—(১) সর্বহারার একনায়কতন্ত্র এবং (২) জনগণতন্ত্র।

সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনায় প্রসঙ্গত আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রবিদ ডেভিড ইস্টন (David Easton), অ্যালান বল (Alan R. Ball), অ্যামন্ড ও পাওয়েল (Almond and Powel) প্রমুখ ব্যক্তি সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত উপরিউক্ত আলোচনাধারাকে অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণায় কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক বা কাঠামোগত আনুষ্ঠানিক রূপটির মধ্যে সরকারের মূল প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং দেশের ঐতিহাসিক ভৌগোলিক অর্থনৈতিক মনস্তাত্ত্বিক কিম্বা সামাজিক বিষয়গুলি সরকারের রূপ ও মূল প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। এইসব কারণে আধুনিক এইসব রাষ্ট্রবিদ সরকার ও তার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত আলোচনার পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থার (Political System) শ্রেণীবিভাগের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। যেমন—রাষ্ট্রবিদ বল বলেন—'A more rewarding approach to the problems of classifications woulds be to classify types of political systems rather than to concentrate on types of Government.' রাষ্ট্রবিদ ইস্টন বলেন, সমাজের সবরকম রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির গঠন প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপকে ঘিরে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্ম হয়। এ কারণেই রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল।

অ্যালান বল রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলি হল ঃ (১) উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Liberal Democratic System) ; (২) সর্বাত্মক ব্যবস্থা (Totalitarian System) এবং (৩) স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Autocratic System)। বলে ধারণায় উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রিক হ'তে পারে এবং মন্ত্রীসভা শাসিত বা রাষ্ট্রপতি শাসিতও হ'তে পারে। আবার সর্বাত্মক ব্যবস্থা সাম্যবাদী অথবা ফ্যাসীবাদী হ'তে পারে। আর স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থারও দুটি রূপ থাকতে পারে—সাবেকী ও আধুনিক। তা ছাড়া আধুনিক স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা কখনও সামরিক কখনও বা অসামরিক হ'তে পারে।

## ১৪.৩ সরকার বা শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাজনের সমস্যা

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিদ্ যাঁদের মধ্যে আছেন ইস্টন, অ্যামন্ড ও পাওয়েল কিম্বা বল প্রমুখ, সরকার বা শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতে, কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক বা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেখে তার ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ করলে তা বাস্তব বা প্রকৃত শাসনব্যবস্থাকেও তার প্রকৃতিকে অনুধাবন করতে সাহায্য করে না। বরং দেখা যায়, সরকারের নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সরাসরি শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত নয় এবং সংবিধান অনুসারে গঠিত নয় এমন বহু সংঘ ও প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেয়।

এইসব কারণে, বিভিন্ন দেশের সরকারের আনুষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে মিল থাকলেও সরকারের কার্যগত

উপাদানের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন—ব্রিটেন ও ভারত—উভয় দেশেই সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও দুই দেশের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার উপাদানগুলি একরকম হয় না। লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রভৃতি ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে ব্রিটেনের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য উপাদান হ'ল অলিখিত সংবিধান ও এককেন্দ্রিক কাঠামো বংশানুক্রমিক অথচ সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র ইত্যাদি। আবার ফ্যাসীবাদী ও নাৎসীবাদী একনায়কতন্ত্র এবং সর্বহারার একনায়কতন্ত্র নামে অনেকটা এক হলেও কর্মসূচী লক্ষ্য ও প্রকৃতিগত বিচারে এক নয়।

তেমনি সরকারের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির নাম এক হ'লেও বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের ভূমিকা স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপ্রধানের নাম 'রাষ্ট্রপতি' (President)। কিন্তু উভয় দেশের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা এক নয়। মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রকৃত অর্থেই দেশের শাসনপ্রধান (Real Head)। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন নামসর্বস্ব প্রধান বা নিয়মতান্ত্রিক প্রধান (Constitutional Head)। সম্ভবত, সে কারণে রাষ্ট্রবিদ বল মন্তব্য করেন—Political institutions with the same lable may carry out different functions in the political processes of different States.

এ ছাড়াও অনেক রাষ্ট্রবিদ সরকারের শ্রেণীবিভাগের আরও কতকগুলি অসুবিধার কথা বলেন। তার একটি হ'ল শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে বেশির ভাগ সময়েই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মূল্যমান নিরপেক্ষ (Value free) হ'তে পারেন না। দ্বিতীয়ত, এমন অনেক শাসনব্যবস্থা আছে, সেগুলিকে এই শ্রেণীবিন্যাসের ছকের মধ্যে ফেলা যায় না। তৃতীয়ত, বিশ্বের বিশেষ করে আফ্রিকা ও এশিয়ার কোনও কোনও দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ে এই সমস্যায় পড়তে হয়। যেমন—ইরাক, ইরান বা মিশরের শাসনব্যবস্থাগুলি আক্ষরিক অর্থে নায়কতান্ত্রিক নয়, আবার সেগুলিকে উদার গণতান্ত্রিকও বলা যায় না।

## ১৪.৪ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা শ্রেণীবিভাজনের সমস্যা

ক্ষমতার বন্টনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে দু'টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। সংবিধান অনুসারে ক্ষমতা একটি কেন্দ্রে ন্যস্ত থাকলে তাকে বলা হয় এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা। অন্যদিকে সংবিধান অনুসারে ক্ষমতা আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে বন্টিত হ'লে তাকে বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। রাষ্ট্রবিদ গার্ণার এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন সরকারের সেই রূপকেই এককেন্দ্রিক বলা হয় যাতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসনক্ষমতা একটি মাত্র সংস্থা অথবা সংস্থাগুচ্ছের মধ্যে অবস্থিত এবং একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে পরিচালিত হয় ও কেন্দ্রীভূত থাকে (Unitary Government is that form in which the supreme governing authority of a State is concentrated in a single organ or set or organs, established at and operating from a common centre)। আইনবিদ্ ডাইসি তাঁর সংজ্ঞায় সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নের ক্ষমতার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, একটি কেন্দ্রীয় শক্তি সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নের 'বৈধ ক্ষমতার' অধিকারী হ'লে সেই শাসনব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক বলা যায় (....the habitual exercise of supreme legislative authority by one central power)। অবশ্য ইচ্ছে করলে বা প্রয়োজন হ'লে এককেন্দ্রিক সরকার ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করতে পারে বা অন্য কোনও সংস্থাকে আইন তৈরীর

ক্ষমতা দিতে পারে। কিন্তু, সেক্ষেত্রেও এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাই সর্বোচ্চ ; কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রণীত আইনই সর্বোচ্চ। যেসব সংস্থার হাতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত হয়, তাদের ক্ষমতার উৎসাহ কেন্দ্রীয় সরকার এবং সেজন্য তারা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। মনে রাখা দরকার, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা।

বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ সি. এফ. স্ট্রং বলেন এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হ'ল কেন্দ্রীয় আইনসভার আইনগত প্রাধান্য ; ডাইসি যাকে বলেন 'আইনসভার সার্বভৌমত্ব'। দ্বিতীয়টি হ'ল অন্য কোনও সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থার অনস্তিত্ব। কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রাধান্য বলতে কী বোঝায়, তা ব্যাখ্যা করে ডাইসি বলেন, এর অর্থ—প্রথমত, কেন্দ্রীয় আইনসভা যে কোনও আইন তৈরী করতে পারে বা কোনও প্রচলিত আইন বাতিল করতে পারে ; দ্বিতীয়ত, আইনসভার তৈরী আইনকে রদ করার অধিকার অন্য কারও থাকে না এবং তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় আইনসভা দ্বারা সৃষ্ট আইন দেশের সর্বত্র প্রযোজ্য হয়।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল, এই ব্যবস্থার সংবিধানের প্রাধান্যের পরিবর্তে আইনসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় অন্য সব আইন তৈরীর সংস্থাগুলিকে অধীনস্থ করার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ, গোটা দেশের জন্য প্রযোজ্য আইন তৈরীর চূড়ান্ত অধিকারী একমাত্র আইনসভা। স্ট্রং (Strong) একেই বলেন, 'সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনও সংস্থার অনস্তিত্ব'।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল এখানকার সংবিধান লিখিত হ'তে পারে, অলিখিতও হ'তে পারে। নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সংবিধান লিখিত, কিন্তু ইংল্যান্ডের সংবিধান অলিখিত। তবে লিখিত-অলিখিত যাই হোক না কেন, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা যেসব দেশে আছে, সেখানকার সংবিধান সুপরিবর্তনীয় বা নমনীয়।

## ১৪.৪.১ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সুবিধা আছে। যেমন—

(১) এই শাসনব্যবস্থার একটি প্রধান গুণ সমগ্র দেশে একই আইন, একই কর্মসূচী এবং একই শাসনপদ্ধতি অনুসৃত হয়। ফলে শাসনকার্য পরিচালনায় যেমন জটিলতা কম হয়, সরকারও তেমন প্রকৃত অর্থে ক্ষমতাসম্পন্ন ও শক্তিশালী হয়।

(২) এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার আর একটি সুবিধা হ'ল, নাগরিকদের আনুগত্য একটিমাত্র শাসনব্যবস্থার প্রতি থাকার দরুণ আঞ্চলিকতার সমস্যা মাথাচাড়া দেয় না এবং তার ফলে বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তিগুলি বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় না। বরং, একই ধরনের আইন ও শাসনব্যবস্থা দেশের ঐক্য ও সংহতিকে সুনিশ্চিত করে।

(৩) এই শাসনব্যবস্থার ক্ষমতা একাধিক সরকারের মধ্যে বণ্টিত হয় না। ফলে কেন্দ্র ও অঞ্চলের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে বিরোধ-বিসংবাদের সম্ভাবনা থাকে না।

(৪) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার আর একটি বড় সুবিধা হ'ল সংবিধানের নমনীয়তা। এর ফলে পরিবর্তিত সামাজিক চাহিদার সাথে সংগতি রেখে সংবিধান পরিবর্তন সহজসাধ্য হয়।

(৫) শাসনব্যবস্থার সরলতা ও ব্যয়সংক্ষেপ এই শাসনব্যবস্থার আর একটি গুণ। বাস্তবিক কেন্দ্র ও অঞ্চলের দু'ধরনের আইন ও প্রশাসন গড়ে না ওঠার দরুন এই সুবিধা পাওয়া যায়। এবং

(৬) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জগতে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা খুবই উপযোগী। একটিমাত্র শাসনকেন্দ্র থাকার ফলে আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব পালন অনেক বেশি সহজসাধ্য হয়।

তবে, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার অসুবিধার কথাও একই সাথে মনে রাখা দরকার। যেমন—

(১) একটি মাত্র সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার বা স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির সৃষ্টির সম্ভাবনা থেকে যায়। এই সম্ভাবনা বা ঘটনা গণতন্ত্রের বুনিয়াদকে দুর্বল করে। তাছাড়া ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ না হওয়ার দরুণ সরকারের কাজেকর্মে অংশ নেওয়ার সুযোগ কমে যায়, যা শেষ পর্যন্ত নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনার বিস্তার রুদ্ধ করে।

(২) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় গড়ে ওঠা একই ধরনের আইন ও প্রশাসন বিভিন্ন অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যের পক্ষে ক্ষতিকর। সাধারণভাবে ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি কিংবা অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্য বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্য আনে। আর দেশের ঐক্য বলতে আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের অবলুপ্তি বোঝায় না—বরং স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্যকে বজায় রেখেই ঐক্য স্থাপিত হ'তে পারে।

(৩) আধুনিক রাষ্ট্রগুলি কেবল আয়তনেই বড় নয়, জনসংখ্যার দিক থেকে বিশাল। তার ফলে, দেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সবসময় দেখা যায়। অভিজ্ঞতায় স্পষ্ট এইসব সমস্যা সমাধানে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা তেমনভাবে কার্যকর হয় না। একটি উদাহরণ বিষয়টিকে সহজবোধ্য করতে পারে। জাতিগোষ্ঠীগুলির যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আজ সমগ্র পৃথিবীতে স্বীকৃত, সেই আত্মনিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করতে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার পরিচালকরা প্রায়শ ব্যর্থ হন।

(৪) ক্ষমতা একটি মাত্র সরকারের হাতে থাকলে তার পক্ষে দায়ভারে ভারাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। অথচ, বর্তমানে রাষ্ট্রগুলির দায়দায়িত্ব ও কার্যাবলী অনেক বেড়ে গিয়েছে। অধুনা রাষ্ট্র কেবল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বা বিদেশীনীতি নির্ধারণ বা ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে রক্ষাই করে না, নানাবিধ কল্যাণমূলক কর্মসূচীর রূপায়ণের দায়িত্বও তাদের নিতে হয়। ফলে, মাত্রাতিরিক্ত দায়ভারে ভারাক্রান্ত সরকার কোনও দায়িত্বই সুচারুভাবে সম্পাদন করতে পারে না।

(৫) কোনও কোনও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার আর একটি দুর্বলতার কথা বলেন। তাঁদের কথায়, এই শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার কেন্দ্র একটি হওয়ার ফলে দেশের বাইরেও ভিতরে বিপদ দেখা দিতে পারে। কারণ, ক্ষমতার কেন্দ্র একটি এবং সেটি দখল করতে পারলেই রাষ্ট্রকে বিপর্যস্ত করে দেওয়া যায়।

সব মিলিয়ে তাই বলা যায়, জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন জনগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট রাষ্ট্রের পক্ষে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষভাবে উপযোগী। ইংল্যান্ডের মত সমজাতিবিশিষ্ট ছোট রাষ্ট্রে এই ধরনের সরকারের সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। আবার যেসব দেশের জনসাধারণ রাজনৈতিকভাবে সচেতন, সেসব ক্ষেত্রেও এককেন্দ্রিক সরকারের সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যেসব দেশ আয়তনে বিশাল এবং প্রকৃতিগতভাবে বৈচিত্র্যময়, সেখানে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা মোটেই উপযোগী নয়। ভারতবর্ষ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই রকমই দেশ।

## ১৪.৫ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলতে বোঝায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গার্ণারের ভাষায়—কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারকে নিয়ে গঠিত একটি মিলিত ব্যবস্থা (It is a system composed of the central and the local governments combined)। আইনবিদ্ ডাইসি এই ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, সংবিধান অনুসারে উদ্ভুত ও সংবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি সমশ্রেণীভুক্ত অংশের মধ্যে রাষ্ট্রশক্তির বন্টন।

ডাইলি প্রদত্ত উল্লিখিত সংজ্ঞায় দু'টি প্রবণতার অস্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে জাতীয় ঐক্য ও অন্যদিকে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ঝোঁক, এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রবণতার মধ্যে সংগতিবিধান করার প্রচেষ্টার ফলেই যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম। সেজন্য তাঁর মন্তব্য যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় ঐক্য ও ক্ষমতার সঙ্গে 'রাজ্যের অধিকারের' সংগতিবিধান করার রাজনৈতিক উপায় ''(A federal State is a political contrivance intended to reconcile national unity with the maintenance of State rights'')। এর থেকে বোঝা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের পেছনে দু'টি প্রবণতা বা শক্তি কাজ করে। একটি জাতীয় ঐক্যের শক্তি, যাকে বলা যায় কেন্দ্রাভিমুখী প্রবণতা বা শক্তি (Centripetal force)। অন্যটি আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষা, যেটি কেন্দ্রাতিগশক্তি (Centrifugal force)। বস্তুত, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যেই কেবল এই প্রবণতাদ্বয়কে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

আর একজন বিশিষ্ট সংবিধানবিদ কে. সি. হোয়্যার (K. C. Wheare) যুক্তরাষ্ট্র বলতে বোঝান একটি নির্দিষ্ট ধরনের শাসনব্যবস্থা যাতে সংবিধান সমগ্র দেশের সরকার বা জাতীয় সরকার (National Government) এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতা বন্টন করে দেয় যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং পরস্পরের সহযোগী হয়। (''By the federal principle I mean the method of dividing power so that the general and regional Governments are each, within a sphere, co-ordinate and independent'') এই সংজ্ঞায় কেবল সংবিধান কর্তৃক ক্ষমতা বন্টন নয়, জোর দেওয়া হয়েছে ক্ষমতা বন্টনের নীতিটির উপর যাতে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকার পরস্পরের অধীনতা থেকে মুক্ত (Independent) এবং পরস্পর সহযোগী (co-ordinate) হ'তে পারে। হোয়্যারের ভাষায় এটিই হ'ল যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি (Federal principle)।

তবে, উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলিতে মূলত যুক্তরাষ্ট্রের আইনগত ও সাংবিধানিক কাঠামোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাকে আদর্শস্থানীয় বলে গণ্য করা হয়েছে, অথচ যুক্তরাষ্ট্রের মূল কথা হ'ল সমাজের বহুত্ববাদী চরিত্রের রাজনৈতিক রূপায়ণ। উইলিয়ম লিভিংস্টোন (William S. Livingstone)-এর ভাষায় ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হ'ল সেই ব্যবস্থা যার দ্বারা সমাজের বহুত্ববাদী চরিত্র মূর্ত এবং সংরক্ষিত হয়'।

এইসব কারণে, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যুক্তরাষ্ট্রের সংজ্ঞা নতুন করে নিরূপণ করার চেষ্টা করেছেন। এঁদেরই একজন হলেন এ. এইচ. বার্চ। বার্চ-এর কথায়, যুক্তরাষ্ট্র হ'ল সেই শাসনব্যবস্থা যেখানে একটি সমগ্র দেশের সরকার এবং কতকগুলি আঞ্চলিক সরকার থাকে এবং তাদের মধ্যে ক্ষমতা এমনভাবে বন্টিত হয় যাতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকায় অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে এবং নিজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে

জনগণকে শাসন করে। এই সংজ্ঞার সব থেকে বড় কথা হ'ল, এখানে যুক্তরাষ্ট্র সাংবিধানিক ব্যবস্থার পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে এবং আঞ্চলিক সরকার-এর স্বাধীনতার পরিবর্তে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের (autonomy) ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও প্রাচীনতম উদাহরণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে বহু রাষ্ট্রেই যেমন কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড কিম্বা ভারতে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা দেখা যায়। এইসব যুক্তরাষ্ট্র বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হ'ল ঃ

(১) সব যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাতেই একটি সবচেয়ে লিখিত ও কিছুটা পরিমাণে দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির সংবিধান অপরিহার্য সংবিধানেই কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এবং এই ক্ষমতা বিভাজন সুস্পষ্ট করার জন্যই সংবিধানকে অলিখিত হ'তে হয়। তাছাড়া, সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারাগুলির সংশোধন পদ্ধতিতে কেন্দ্র ও অঞ্চল উভয় সরকারের সম্মতি আবশ্যিক করার জন্যই সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির করে তোলা হয়।

(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে শাসন-কর্তৃত্ব দু'ধরনের সরকার মধ্যে বন্টন করা হয়। সমগ্র দেশের জন্য জাতীয় বা কেন্দ্রীয় সরকার ও অঞ্চলগুলির জন্য আঞ্চলিক বা রাজ্য সরকার। সংবিধান কেবল এই দুই স্তরের সরকারের মধ্যেই ক্ষমতা বন্টন করে।

(৩) শাসন কর্তৃত্বের বন্টন ব্যবস্থার পাশাপাশি দু'টি সরকারের মধ্যে সুস্পষ্ট ক্ষমতার পার্থক্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য। অবশ্য ক্ষমতা বিভাজনের নীতি ও পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি তালিকাতে জাতীয় সরকারের ক্ষমতার ক্ষেত্রগুলিকে সুনির্দিষ্ট করে অন্য সব বিষয় রাজ্যগুলির হাতে অর্পণ করা হয়েছে। আবার, ভারতে তিনটি তালিকা—কেন্দ্র, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকা ক্ষমতা বিভাজনের পদ্ধতিটিকে নির্ধারণ করে।

(৪) ক্ষমতা বন্টনের পাশাপাশি কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকারের নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য। কেন্দ্রীয় আইনকে রূপায়িত করে কেন্দ্রীয় প্রশাসন আর অঞ্চলগুলিতে আইন অনুযায়ী শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে আঞ্চলিক প্রশাসনব্যবস্থা।

(৫) সংবিধানের সার্বিক প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কেন্দ্রও আঞ্চলিক—উভয় সরকারের ক্ষমতার উৎস সংবিধান, যাকে অনেক সংবিধানবিদ আবার সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস বলে ভাবতে চান।

(৬) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল 'স্বাধীন ও নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়। ক্ষমতা বন্টন নিয়ে কেন্দ্র ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে কোনও বিরোধ দেখা দিলে বা সংবিধানে উল্লিখিত কোনও বিষয় নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিলে তার মীমাংসার ভার দেওয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রী আদালতকে। বস্তুত সংবিধানকে ব্যাখ্যা করা এবং সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষাই যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের সব থেকে বড় কাজ বলে এই আদালতকে 'সংবিধানের অভিভাবক' বলা হয়।

(৭) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল দ্বৈত-নাগরিকত্ব'। এর অর্থ নাগরিকরা যেমন সমগ্র দেশের নাগরিক তেমনি নিজ নিজ অঞ্চলেরও নাগরিক। তবে, এই ধরনের নাগরিকত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত কোনও কোনও দেশে দেখা যায়—আর সে কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই বৈশিষ্ট্যটিকে অপরিহার্য বলে মনে করেন না।

(৮) শেষ বৈশিষ্ট্য হ'ল দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। আইনসভায় দ্বিতীয় কক্ষটি হয় যুক্তরাষ্ট্রীর কক্ষ—যার মূল লক্ষ্য হ'ল যুক্তরাষ্ট্রী ব্যবস্থার মূলকাঠামোটিকে সুরক্ষিত রাখা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতের মত দেশে এই বৈশিষ্ট্যটি বিদ্যমান।

## ১৪.৫.১ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ

পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ আজ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় বাস করে। এর কারণ, এই ব্যবস্থার বেশ কিছু সুবিধা। অবশ্য অসুবিধাও কিছু আছে। প্রথমে সুবিধার কথাগুলি বলা যায়। তারপর অসুবিধা বা ত্রুটির কথা।

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রথম এবং প্রধান সুবিধা হ'ল ছোট এবং দুর্বল রাষ্ট্রকে এই ব্যবস্থার অধীনে একত্রিত করে একটি বড় ও শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয়। আর ছোট ছোট রাষ্ট্র বা অঞ্চলগুলি অতি সহজেই নিজের স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব বিসর্জন না দিয়েও একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের অঙ্গ হতে পারে।

(২) যেসব দেশে নানা জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে, যাদের আচার ব্যবহার ভাষা-সংস্কৃতি পরস্পর থেকে আলাদ সেসব দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা খুবই উপযোগী। কারণ, এই ব্যবস্থায় তারা একই রাষ্ট্রভুক্ত থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করে এবং তাদের স্বাতন্ত্র্য ও আত্মপরিচয় অবিকৃত রেখে 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সমস্যাগুলির সমাধান করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় আঞ্চলিক সরকারগুলির ওপর। অঞ্চলের মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠা এই সরকারের পক্ষে অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত ও দক্ষতার সাথে এই সব সমাধান কার্য সম্পাদিত হয়। সম্ভবত এ কারণেই অনেকে বলেন, এই শাসনব্যবস্থা অনেক বেশি দক্ষ ও যোগ্য।

(৪) এই ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় স্তরে ক্ষমতার কেন্দ্রিভবন না হবার দরুণ স্বৈরাচারী শক্তির উদ্ভব ঘটে না বা ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ কমে যায়। আঞ্চলিক সরকারগুলির অনেকটা 'ওয়াচ ডগ' এর মত ভূমিকা নেয়।

(৫) লর্ড ব্রাইস-এর মত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে এক ধরনের রাজনৈতিক পরীক্ষাগার হিসেবে ভাবতে চেয়েছেন যেখানে কোনও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্তত আঞ্চলিক স্তরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ থাকে। পরীক্ষার ফল ইতিবাচক হ'লে সিদ্ধান্তটিকে জাতীয় স্তরে প্রয়োগ করার উদ্যোগ নেওয়া যায়। এবং

(৬) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সরকারী কাঠামো যেমন স্থায়িত্ব পায়, বাইরের আক্রমণ বা অন্তঃবিপ্লবের দরুণ রাষ্ট্রব্যবস্থা তেমন সহজে ভেঙ্গে পড়ে না। ক্ষমতা একটি মাত্র কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত না থাকার দরুনই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই প্রতিরোধ শক্তি গড়ে ওঠে।

পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ত্রুটিগুলির ব্যাপ্তি অপেক্ষাকৃত কম হ'লেও অনুল্লেখ্য নয়। যেমন, এই ব্যবস্থার সব থেকে বড় ত্রুটি হ'ল এর অন্তর্নিহিত দুর্বলতা যা লীককের (Leacock) ভাষায় 'কাঠামোগত ত্রুটি'। এই ধরনের ত্রুটি হ'ল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা যতটা সার্থক অর্থনৈতিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রায় ততটাই দুর্বল। তাছাড়া, ক্ষমতা বন্টন নিয়ে বিরোধ অথবা স্বতন্ত্র আইন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা কাঠামোগত ত্রুটির আর একটি নিদর্শন।

(২) আঞ্চলিক সরকারগুলির প্রতি আনুগত্য নাগরিকদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সম্পর্কিত বিশ্বাস ও প্রত্যয়ে ফাটল ধরতে পারে—অন্তত এক ধরনের সম্ভাবনা থেকে যায়। তাছাড়া, কেন্দ্রাভিগামী ও কেন্দ্রাতিগ

শক্তির ভারসাম্য কোনও কারণে বিনষ্ট হ'লে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনাটাই সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। ফলে, প্রকট হয়ে ওঠে বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তির উত্থান।

(৩) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি সমস্যা। কারণ, এই ধরনের সংবিধান অনেক সময় সমাজ-প্রগতির গতির সাথে পাল্লা দিতে পারে না। এবং

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার আর একটি বড় ত্রুটি হ'ল এর ব্যয়বাহুল্য। একাধিক আইনসভা, প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা থাকায় প্রায় সব যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বিপুল ব্যয়ের বোঝা বহন করতে হয়। আর্থিক দিক থেকে দুর্বল দেশের কাছে এই বোঝা বহন দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

সব মিলিয়ে বলা যায়, বহুজাতি ভিত্তিক রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্র হ'ল এক আদর্শ শাসনব্যবস্থা। তাছাড়া দেশের আয়তন যদি বড় হয়, জনসংখ্যা বেশি হয়—তাহলেও এই ব্যবস্থা কাম্য। সর্বোপরি সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতি বা ছোট ছোট দেশ একত্রিত হয়ে রাষ্ট্র গড়তে চাইলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাই একমাত্র কাম্য। এখানে বড় রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায়, আবার নিজেদের নিজস্বতাও বজায় রাখা যায়।

## ১৪.৬ আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মৌল ধারণা হল কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য থাকে এবং উভয় ধরনের সরকারই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে কাজ করে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রিকতার প্রতি এক প্রবল ঝোঁক দেখা যায়। প্রায় সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও গুরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পাশাপাশি আঞ্চলিক বা রাজ্য সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ছে। আধুনিক যুক্তরাষ্ট্রে এই কেন্দ্রীকরণের প্রবণতাই 'কেন্দ্রপ্রবণতা' হিসেবে পরিচিত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সুইজারল্যান্ড কানাডা, ভারত বা অস্ট্রেলিয়ার মত প্রায় সব যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্যের লক্ষণ স্পষ্ট।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই সাম্প্রতিক কেন্দ্রপ্রবণতার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। সংবিধানবিদ হোয়্যার চারটি কারণ দেখিয়েছেন, যেগুলি হ'ল যুদ্ধ, আর্থিক সঙ্কট, সমাজ-কল্যাণমূলক কার্যাবলীর বিস্তৃতি এবং পরিবহন ও শিল্পের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য। আবার রাষ্ট্রবিদ জীন ব্লনডেল-এর মতে কেন্দ্রপ্রবণতার মূল কারণ, আর্থিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে —যেমন শিক্ষা, বাসস্থান-সমস্যা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি—কেন্দ্রীয় কল্যাণমূলক কার্যাবলীর বিস্তৃতি। সম্প্রতি বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য আঞ্চলিক সরকারকে এড়িয়ে বিভিন্ন ছোট ছোট আঞ্চলিক সংস্থার যেমন শহরের স্বায়ত্তশাসন সংস্থা কিংবা গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন সংস্থার সহেগ সরাসরি যৌথ উদ্যোগ বা 'পার্টনারশিপ' গড়ে তুলেছে। এছাড়া, আর্থিক সহায়তা, কারিগরী পরামর্শ, প্রশাসনিক নির্দেশ এর মাধ্যমে আঞ্চলিক সরকারগুলিকে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতীয় সরকার প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ, এই সব আলোচনায় স্পষ্টত আর্থিক কারণ কেন্দ্রপ্রবণতার সব থেকে বড় উপায়—যে কারণে সংবিধানবিদ কার্ল লোয়েনস্টাইন (Karl Loewenstein) মন্তব্য করেন, আর্থিক পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ডি. ডি. টি.-র কাজ করছে (Economic planning is the D. D. T. of federalism) অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার পতন ত্বরান্বিত করেছে। নিম্নলিখিত উপায়ে কেন্দ্রপ্রবণতার কারণগুলিকে আলোচনা করা যায় ঃ

(১) **যুদ্ধ ঃ** আধুনিক শতাব্দীতে যে দুটি বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে, তার দু'টিই সামগ্রিক যুদ্ধ। আর এই যুদ্ধে

কেবল সেনাবাহিনী নয়, গোটা দেশই জড়িয়ে পড়েছিল। তাছাড়া, যুদ্ধ আর একটি বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা প্রায় সব দেশেই অর্থনীতির ওপর বিপুল চাপ সৃষ্টি করেছে। যেহেতু সব যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর এই বিপুল ব্যয়বহুল যুদ্ধ পরিচালনা করতে সব কেন্দ্রীয় সরকারকেই দেশের যাবতীয় সম্পদকে একত্রিত হয় এবং যুদ্ধ-পরবর্তীকালে অস্ত্র প্রতিযোগিতাতেও এই চালিয়ে যেতে হয়। আর এর জন্য নীট ফল কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি।

(২) আর্থিক সঙ্কট ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী জুড়ে যে আর্থিক মহাসঙ্কট দেখা দিয়েছিল তার মোকাবিলা করতে রাষ্ট্রীয় ব্যয় ও উদ্যোগ বাড়াতে হয়েছে। আবার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেকারি দ্রব্যমূল্য, বৃদ্ধি, শিল্প-কারখানায় মন্দা ইত্যাদি যে সঙ্কট তৈরী করেছে, সেই সঙ্কটের সমাধান এমনকি আশু উপশমও কোনও আঞ্চলিক সরকারের পক্ষেই করা সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত এই দায়িত্ব নির্বাহের কাজ জাতীয় সরকারগুলিকেই করতে হয়েছে—যার দরুণ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা অপ্রহিতভাবে বেড়েছে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির আর একটি কারণ সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রের জনকল্যাণকর কর্মসূচীর বিস্তৃতি। অধুনা প্রায় সব সরকারকেই শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য সামাজিক নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে হয়। আর প্রথমত, এইসব ব্যবস্থাই করতে হয় গোটা দেশের জন্য। দ্বিতীয়ত, এর জন্য সরকারকে বিপুল ব্যয়ভার বহন করতে হয় এবং তৃতীয়ত, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের কর্মসূচীর রূপায়ণের জন্য প্রশাসনিক দক্ষতা প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ, কল্যাণমূলক কাজগুলি সম্পাদনের ভার কখনই আঞ্চলিক সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকারকেই উদ্যোগ নিতে হয়। ফলশ্রুতি, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি।

(৪) যোগাযোগ ও পরিবহণ শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতিকেও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়। বাস্তবিক যোগাযোগ ও পরিবহন শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে বর্তমানে আন্তঃরাজ্য বা আন্তঃপ্রাদেশিক সম্পর্ক অনেক নিবিড় হয়েছে। শিল্প ও কল-কারখানার ক্ষেত্রে বিপুল সমৃদ্ধি সমগ্র দেশের বাজারকে সংগঠিত করতে চেয়েছে। সর্বোপরি, আর্থিক লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যও রাজ্যের বা অঞ্চলের সীমানা পেরিয়ে জাতীয় স্তরে প্রসারিত হয়েছে। আর এ সবের দরুন কেন্দ্রাভিগামী শক্তি বা জাতীয় ঐক্যের মনোভাব প্রবলতর হয়েছে।

(৫) সাম্প্রতিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় সাফল্যও কেন্দ্রপ্রবণতাকে স্পষ্ট করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে প্রতিটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ এবং নির্ভরতা অসামান্যভাবে বেড়ে গিয়েছে। অঞ্চলগুলির মানুষের মধ্যে চলাচল বা 'mobility' বেড়েছে, আর তাই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের ধারণা অনেকটাই ঝাপসা হয়ে আসছে।

(৬) জাতীয় সরকারের প্রভাব বেড়ে যাবার আর একটি কারণ আর্থিক পরিকল্পনা। উন্নয়নশীল (অনুন্নত' কথাটির ইদানিংকালে আর ব্যবহার করা হয় না) দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এবং সমাজ-কল্যাণমূলক কার্যাবলীকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়? আর কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অর্থই সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে কেন্দ্রের নির্দেশ দেবার ক্ষমতা বৃদ্ধি।

(৭) প্রায় সব যুক্তরাষ্ট্রেই রাজ্য বা আঞ্চলিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।

কেবল আর্থিক নয়, প্রযুক্তিগত সাহায্যের জন্যও তাদের কেন্দ্র-মুখাপেক্ষী থাকতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই তাই আঞ্চলিক সরকারগুলির ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের পরিধি বাড়ছে।

(৮) যুক্তরাষ্ট্রগুলির বিচার বিভাগও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুকূলে রায় দিয়ে কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংবিধান ব্যাখ্যার মাধ্যমে আদালত এই ভূমিকা পালন করেছে। অর্থাৎ সংবিধানের সংশোধন ছাড়াই বিচারপতিদের ভাষ্যের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে।

সব মিলিয়ে তাই একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি যেমন এক বাস্তব সত্য, তেমন সমস্যাসঙ্কুল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কাম্য বলেও মনে হয়। তবে এ ব্যাপারটিও স্মরণ রাখা দরকার যে যুক্তরাষ্ট্রে অংশগ্রহণকারী জাতিগুলির স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি সংরক্ষণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের যত্নশীল হওয়া উচিত। তবে সাম্প্রতিককালে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ধারণা (Co-operative Federalism) প্রসার লাভ করেছে। দু'ধরনের সরকারের পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা এখন আর বড় করে দেখা হয় না। বরং জাতীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গী আজ অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়।

## ১৪.৭ অনুশীলনী

১। শাসনব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কিত সাবেকী পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করুন এবং এই ব্যবস্থার জটিলতাগুলি লিখুন।

২। সরকারের চিরাচরিত শ্রেণীবিভাগের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন। এই প্রসঙ্গে শ্রেণীবিভাজন প্রচেষ্টার অসুবিধাগুলি দেখান।

৩। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা কাকে বলে? এই ধরনের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৪। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সুবিধে-অসুবিধে বা দোষ গুণ কী কী? কোন কোন ক্ষেত্রে এই শাসনব্যবস্থা উপযোগী?

৫। যুক্তরাষ্ট্র বা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কাকে বলে? যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করুন।

৬। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন। এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করুন।

৭। বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রসমূহ কেন্দ্রপ্রবণতার প্রধান কারণগুলি কী কী?

## ১৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী


1. Blondel J. (Ed.) : *Comparative Goernment, 1985*
2. Gamer J. W : *Political Science and Government, 1951*
3. Roy & Bhattacharya : *Ploitical Theory 1996.*
4. চক্রবর্তী, হিমাচল ঃ *রাষ্ট্রবিজ্ঞান,* ১৯৯৫।
5. মহাপাত্র, অনাদি ঃ *রাষ্ট্রবিজ্ঞান,* ১৯৯৬।